সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর ২০১৩

কথা দাও আবার আসবে...

শ্রদ্ধাঞ্জলি
পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী

আরও লিখেছেন: ইমদাদুল হক মিলন। রূপায়ণ ভট্টাচার্য। মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

২৪ অক্টোবর ২০১৩ নয়াদিল্লিতে
রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারত ভ্রমণরত
বাংলাদেশের ১০০জন যুব প্রতিনিধির
উদ্দেশ্যে ভাষণরত রাষ্ট্রপতি
শ্রী প্রণব মুখার্জি

৫ অক্টোবর ২০১৩ ভেড়ামারায় ৩৬০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড
সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের
মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নতুন ও নবায়নযোগ্য
শক্তিমন্ত্রী ড. ফারুক আবদুলাহ। ভিডিও কনফারেন্সে নয়াদিল্লিতে
অনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং

১৪ অক্টোবর ২০১৩ বঙ্গভবনে বিজয়া
সম্মিলনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এডভোকেট
আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের ডেপুটি
হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী

১৬ নভেম্বর ২০১৩ ঢাকার সবুজবাগে
ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে পাঠাগার ও
ভোজনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটনরত ভারতের
হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

৯ নভেম্বর ২০১৩ ITEC দিবস উপলক্ষে
ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
বক্তব্যরত এক প্রশিক্ষিত নারী। মঞ্চে উপবিষ্ট
হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন ও বাংলাদেশ
সংসদের মাননীয়া স্পিকার
শিরীন শারমীন চৌধুরী

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চল্লিশ | সংখ্যা ০৭ | কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২০ | নভেম্বর ২০১৩

লোকপার্বণ নবান্ন

দীপাবলি

সূচিপত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি: কথা দাও আবার আসবে ০৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি: ক'জনা তোমার মত গাইতে জানে ০৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি: সোনালি বিকেলগুলো ১৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি: মান্না দে: অমৃত সন্ধানে ১৮

কবিতা ২৪

প্রবন্ধ: লোকপার্বণ নবান্ন ২৬

ভ্রমণ: হৃদয় আমার প্রকাশ হল ৩০

ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৩

দুই চক্রের দহনে ৩৭

ছোটগল্প: দিন শেষের রাঙা মুকুল ৪১

অনুবাদ গল্প: নামের খোঁজে ৪৪

দীপাবলি ৪৮

কথা দাও আবার আসবে...

সঙ্গীতের মানচিত্রে যুগে যুগে, কালে কালে বহু শিল্পীর আবির্ভাব হয়। আবার কালের নিয়মে তাঁরা চলেও যান এক সময়ে। কিন্তু কিছু কিছু শিল্পী কখনো এমনও আসেন, যাঁদের গান সারা জীবন ধরে মনের কোণে চিরস্থায়ী আসন করে নেয়। আর এই অনুভূতিই যখন পৃথিবীর কোণে কোণে বহু মানুষের হৃদয়ে জেগে ওঠে, তখন ভালবাসার সেই শিল্পীই হয়ে ওঠেন কালজয়ী। তেমনই এক ড়াণজন্মা শিল্পী হলেন মান্না দে। মান্না দে-র মত শিল্পীর সাঙ্গীতিক মূল্যায়ন করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতার মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যখন বাংলাদেশের মানুষের ভালবাসার অনুরোধ এল 'মান্নাবাবুর স্মরণে কিছু অন্তত লিখুন...' ফেলতে পারলাম না। বাংলাদেশ আমার পিতৃভূমি। সেই দেশের মানুষ আমার আত্মার পরিজন। তাঁদের অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। সেই আদেশ শিরোধার্য করলাম– কলম ধরলাম হৃদয়ের শিল্পী মান্না দে-র প্রতি প্রণাম জানাতে।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই

এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

ভারত ভ্রমণে বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধিদল

সম্পাদকীয়

গত মাসে আমরা যখন সুকুমার জয়ন্তীর প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আকস্মিক এক আত্মীয়বিয়োগের খবর এল। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, নানা বার্ধক্যজনিত জটিলতায় তিনি ভুগছিলেন আমাদের থেকে বহু দূরে তাঁর দুই কন্যার কাছে বেঙ্গালুরুতে। তবু মেনে নিতে কষ্ট হয়, বার বার মনে হয়, 'মুকুটটা তো পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই।' আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি মান্না দে-র প্রয়াণ আমাদের উজ্জ্বল সঙ্গীত জগতকে স্লান করে গেল। এই সংখ্যা তাই সঙ্গত কারণেই মান্না দে-র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম দিকপাল পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী মান্না দে-র স্মৃতিতর্পণ করেছেন আমাদের একান্ত অনুরোধে। মনের কোঠা থেকে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, মান্না দে-র জীবনীকার রূপায়ণ ভট্টাচার্য ও কবি মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়। যে অনন্তত্মলোকে তাঁর যাত্রা হল, সেখানে তাঁর আত্মার শান্তি হোক, আমাদের এই প্রার্থনা।

বাংলার ঘরে যখন নবান্নের উৎসব, ঠিক তখনই বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধিদের একশোজনের একটি দল ভারত সফর করে এলেন। এটি দ্বিতীয় আয়োজন। গত বছরেও এমন দিনে প্রথম একশো যুব প্রতিনিধি ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন ভারত সরকারের আতিথ্যে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নামীদামী সংগঠনের বাছাই করা একশোজন প্রতিনিধিকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে। সেখানে তাঁরা যেমন ভারতের যুগপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন, তেমনি হালফিলের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি থেকে তথ্যপ্রযুক্তির নানা অশ্রুতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দিবে আব নিবে মিলাবে মিলিবে...' ভারতভূমি হল সেই মিলনের পীঠস্থান। পৃথিবীর কোথাও যদি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান মেলে, তবে সে ভারতেই। ভারতের ধর্ম, ভারতের দর্শন সেই মিলনেরই বার্তা বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

ভারত প্রত্যাগত সেই সব উজ্জ্বল প্রতিনিধির কেউ কেউ তাঁদের ভ্রমণাভিজ্ঞতার বর্ণনা *ভারত বিচিত্রায়* পাঠাচ্ছেন, আমরাও সযত্নে তা পত্রস্থ করছি। আশা করি, নতুনের চোখে সনাতন ভারত পর্যবেক্ষণ যারা পূর্বে ভারত ভ্রমণ করেননি, তাঁদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হবে এবং যাঁরা ইতোমধ্যে করেছেন, তাঁদের কাছে বয়ে আনবে সুখস্মৃতি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কথা দাও আবার আসবে...

অজয় চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীতের মানচিত্রে যুগে যুগে, কালে কালে বহু শিল্পীর আবির্ভাব হয়। আবার কালের নিয়মে তাঁরা চলেও যান এক সময়ে। কিন্তু কিছু কিছু শিল্পী কখনো এমনও আসেন, যাঁদের গান সারা জীবন ধরে মনের কোণে চিরস্থায়ী আসন করে নেয়। আর এই অনুভূতিই যখন পৃথিবীর কোণে কোণে বহু মানুষের হৃদয়ে জেগে ওঠে, তখন ভালবাসার সেই শিল্পীই হয়ে ওঠেন কালজয়ী। তেমনই এক ক্ষণজন্মা শিল্পী হলেন মান্না দে। মান্না দে-র মত শিল্পীর সাঙ্গীতিক মূল্যায়ন করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতার মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যখন বাংলাদেশের মানুষের ভালবাসার অনুরোধ এল 'মান্নাবাবুর স্মরণে কিছু অন্তত লিখুন...' ফেলতে পারলাম না। বাংলাদেশ আমার পিতৃভূমি। সেই দেশের মানুষ আমার আত্মার পরিজন। তাঁদের অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। সেই আদেশ শিরোধার্য করলাম– কলম ধরলাম হৃদয়ের শিল্পী মান্না দে-র প্রতি প্রণাম জানাতে।

একটা সময় ছিল যখন বাংলার মানুষ অপেক্ষা করে থাকতেন দুর্গাপুজোর গানের জন্য। এখনকার মত হাজার হাজার শিল্পী আর গানের ভিড় তো তখন আর ছিল না। আমরা মুখিয়ে থাকতাম সেই 'শারদ অর্ঘ্য' বই আর গুটিকয়েক পুজোর রেকর্ড-এর জন্য। সত্যি বলতে রেকর্ড কিনে বাজাবার মত সামর্থ্য আমাদের পরিবারে সেই সময় ছিল না। এটা ষাটের দশক হবে। পাশের বাড়িতে একটা 'ফিয়েস্তা' ছিল। আমরা সেই বাড়িতেই ভিড় করতাম পুজোর গান শুনতে। রেকর্ডের গানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঐ পাশের বাড়ির ফিয়েস্তার মাধ্যমেই। সেই বাড়ি থেকেই একদিন এল অপূর্ব এক কণ্ঠস্বর– অদ্ভুত সুন্দর এক গান 'তুমি আর ডেকো না...'।

মান্না দে-র সঙ্গে আলাপরত পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী– মাঝে চিত্রপরিচালক গৌতম হালদার

সত্যি বলছি, গান শেষ হয়ে যাবার বহুক্ষণ পরেও কি রকম যেন ঘোর থেকে গেল। রেকর্ড বাজতে থাকল– 'এই তো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে– আমার অবুঝ বেদনা...' –জানলাম শিল্পীর নাম মান্না দে। গান আমি ছোটবেলা থেকেই গাইতাম– শেখা-রেওয়াজ সবই চলছে জোর কদমে। সঙ্গীতের ছাত্র হিসাবে সুরের আনাগোনা– অলংকার– বিন্যাস এগুলোই আকর্ষণ করত বিশেষভাবে। গান শুনলে সুরটা যেন কী ভাবে মনে থেকে যেত। সুরটাই গুন গুন করতাম সারাদিন। কিন্তু মান্নাবাবুর এই গানগুলো শোনার পরে খুব অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম– শুধু সুর নয় কথাটাও মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। শিল্পী যেন কী এক জাদুবলে গানের কথাগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন। কেন এমন হল? এমন তো আগে হয়নি কখনো। আমার কিশোর মনের গভীরে কী যে আলোড়ন– সে কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। আরও বেশি শুনতে লাগলাম মান্নাবাবুর গান– 'কথা দাও আবার আসবে...' বিশেষত '...আবার নদীর কূল ভাসবে' গাইবার সময় ছোট একটা তান উনি নিয়েছেন অদ্ভুত সাবলীলতায়– কিন্তু সে তান কখনোই কথাকে ছাপিয়ে যায়নি– বরং সেই তানে রয়েছে নদীর দু'কূল ছাপিয়ে জলের উছলে পড়ার তরঙ্গ। আজও ভাবলে অবাক হই কী অদ্ভুত ব্যালান্স– এ যেন কথা আর সুরের শুভ পরিণয়। শিল্পী তার তন্ত্রধারক।

আমি ধীরে ধীরে বোধের এক ধাপ উপরে উন্নীত হলাম। গান মানে কি? গান কি শুধু সুর? শুধু কথা? কতটা সুর? কতটা কথা? নাকি অব্যক্ত অন্য কোন কিছু? উত্তর খুঁজতে লাগলাম মনে মনে। আর শুনতে থাকলাম আরও আরও গান। 'পারো যদি ফিরে এসো...', 'বড় একা লাগে এই আঁধারে...', 'সেই তো আবার কাছে এলে...'। ততদিনে জানতে পারছি মান্না দের ব হু বহু গানের সুরকার তিনি নিজেই। 'সেই তো আবার কাছে এলে...' কথাটি আমি বহুবার সুর ছাড়া বলে দেখেছি যে, কথার সুরই এ গানের সুর হয়ে উঠেছে– আলাদা করে সুরারোপ করার প্রয়োজন হয়নি। মান্না দে এখানেই স্বতন্ত্র।

আমি একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছি। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমি তখন কলেজে ঢুকেছি। গুরুজী অর্থাৎ গুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে শেখাও চলছে জোর কদমে। রাগ রাগিণী– তাললয়ছ ন্দে ডুবে থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গান শোনার, বোঝার, বিশেষণ করার ও গাইবার অভ্যাসও শুরু হয়ে গেছে তখন থেকেই। জানতে পারলাম মান্নাবাবু মুম্বইবাসী হয়ে বলিউডএর হি ন্দি ভাষার ছবিতে গান গাইছেন জোর কদমে। কলেজের ফাঁকে কখনসখনও একআধটা হি ন্দি ছবিও দেখছি। সেই সময়েই রাজেশ খান্নাঅমিতাভ ব চ্চন জুটির বিখ্যাত ছবি *আনন্দ* দেখলাম। অসাধারণ এই ছবির বেদনার মূল সুরটা যেন আরও নিবিড় হয়েছিল মান্না দের গাওয়া সেই বিখ্যাত গানে। 'জিন্দগি ক্যায়সি ইয়ে পহেলি হায়...' ছবিতে রাজেশ খান্না আর মান্নাবাবুর কণ্ঠ যেন একেঅ ন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। আজও গানটা শুনলে রাজেশ খান্নাজীর মুখটা ভেসে ওঠে মনের আঙিনায়। তিনিও পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন কিছুদিন হল। এই সুযোগে তাঁকেও প্রণাম জানিয়ে রাখলাম। আরও কত কত অমর গান শুনেছি মান্নাবাবুর কণ্ঠে। শুনেছি কাওয়ালী– 'ইয়ারী হ্যায় ইমান মেরা...' বা 'এ্যায় মেরে জোহরা জবিন...'। শুনেছি কিশোরকুমারজীর সঙ্গে ডুয়েট গাওয়া *পড়োসন* ছবির সেই বিখ্যাত গান 'এক চতুর নার, বড়া হোঁশিয়ার...'। এ গান তো প্রায় ইতিহাস হয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে মান্না দের মত একজন সিরিয়াস গায়ক কীভাবে নিজেকে ভেঙেছেন– নতুন করে গড়েছেন– গেয়েছেন অনবদ্য এই কমেডি গান। পরে মান্নাবাবুর কাছেই শুনেছি টানা সাত দিন রিহার্সাল হওয়ার পর অষ্টম দিনে এ গান লাইভ রেকর্ড করা হয়েছিল। যে Seriousness নিয়ে আগে কাজ হত, আজকের দিনে তা কল্পনাই করা যায় না। পাশাপাশি সহশিল্পী মহম্মদ রফি, কিশোরকুমারের জন্য তাঁর যে অকুণ্ঠ প্রশংসা– আজকের শিল্পীদের সেটা শেখা উচিত। এই সময়েই শুনি ওঁর 'পুছোনা ক্যায়সে ম্যায়নে র‍্যায়ন বীতাই...'। শুনে মনে হয়েছিল এ তো 'অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী'র সুর। অবশ্য অন্তরা থেকে এ গান ভিন্ন পথগামী। এছাড়াও 'ছম ছম বাজে রে পায়েলিয়া' বা 'ঝনক ঝনক তোরী বাজে পায়েলিয়া...' –এসব গান বহুবার শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি, গেয়েওছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সত্যি কথা বলতে, সেই সময় বলিউডে রাগাশ্রয়ী কোন গানে পুরুষ কণ্ঠ মানেই মান্নাবাবুর একচ্ছত্র আধিপত্য। নিজের এমনই এক স্বতন্ত্র স্থান তিনি

'কথা দাও আবার আসবে...' বিশেষত 'আবার নদীর কূল ভাসবে' গাইবার সময় ছোট একটা তান উনি নিয়েছেন অদ্ভুত সাবলীলতায় কিন্তু সে তান কখনোই কথাকে ছাপিয়ে যায়নি – বরং সেই তানে রয়েছে নদীর দুকূল ছাপিয়ে জলের উছলে পড়ার তরঙ্গ। আজও ভাবলে অবাক হই কী অদ্ভুত ব্যালান্স– এ যেন কথা আর সুরের শুভ পরিণয়। শিল্পী তার তন্ত্রধারক।

শ্রুতিনন্দনে মান্না দে-কে পুষ্পস্তবকের অভ্যর্থনা দিচ্ছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তীর পিতা অজিত চক্রবর্ত্তী

এতদিন রেকর্ড শুধু শুনতাম। এবার একদিন সময় এল রেকর্ডে আমার গানও ছাপা হল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে, গুরুদের কৃপায় আমার প্রথম রেকর্ড HMV থেকে প্রকাশিত 'নানারঙের গান' শ্রোতাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা, আশীর্বাদ পায়। এটা ১৯৮১ সাল এই রেকর্ডে আমার সাথে তবলা সঙ্গত করেন আমার স্বপ্নের তবলিয়া শ্রী রাধাকান্ত নন্দী– মান্নাবাবুর অধিকাংশ গান তাঁরই বাজানো।

করে নিয়েছিলেন।

কলেজ জীবন থেকেই আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করার সুযোগ আসতে শুরু করে। খেয়াল ঠুমরি– অর্থাৎ রাগ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান তো করতামই– সেই সময়কার জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠানও করতাম প্রচুর। বলে রাখি বেশির ভাগ ড়্রোত্রেই এ সব অনুষ্ঠানের পারিশ্রমিক ছিল লুচিতরকারি, কপাল ভাল থাকলে রিক্সা ভাড়াও জুটে যেত কখনও সখনও। তবু গাইতাম– অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের তাগিদে আর বহু মানুষের ভালবাসার আবদারে। এই সময়ই শুনি মান্নাবাবুর গাওয়া 'লাগা চুনরি মে দাগ...'। ঐ গান শিখে ফেলতে দেরি করিনি মোটেই। কারণ গানের শেষে ছোট্ট একটা তরানা আছে যে। আমি রাগ সঙ্গীতের ছাত্র– গানের শেষে তরানা মানে তো হাতে চাঁদ পাওয়া। রেকর্ডের ছোট তরানাটুকু নিজের মত করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছন্দে-বোলে তানেসরগ মে প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে গাইতাম। আর সেটাই হত আমার অনুষ্ঠানের শেষ গান– আমার তুরুপের তাস। পাড়ায় পাড়ায় কত যে অনুষ্ঠানে এই গান গেয়েছি আর দীর্ঘ দীর্ঘ হাততালির মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ বসে ভাবতে অবাক লাগে– কার গান– আর কে হাততালি কুড়োয়? ভগবান জানেন!

এতদিন রেকর্ড শুধু শুনতাম। এবার একদিন সময় এল– রেকর্ডে আমার গানও ছাপা হল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে, গুরুদের কৃপায় আমার প্রথম রেকর্ড HMV থেকে প্রকাশিত 'নানারঙের গান' শ্রোতাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা, আশীর্বাদ পায়। এটা ১৯৮১ সাল; এই রেকর্ডে আমার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন আমার স্বপ্নের তবলিয়া শ্রী রাধাকান্ত নন্দী– মান্নাবাবুর অধিকাংশ গান তাঁরই বাজানো। আমি খবর পাই, আমার রেকর্ডটি প্রকাশিত হবার আগেই রাধুবাবু সেটি মান্নাবাবুকে শোনান– সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ও আমার প্রতি স্নেহের তাগিদে। মান্নাবাবুও নাকি রেকর্ডটি শুনে খুবই প্রশংসা করেন। অবশ্য এ আমার শোনা কথা। মনে রাখতে হবে এই সময় আমি সারাদেশে রাগ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও করছি। গুরুজী ও আমার ওস্তাদ, ওস্তাদ মুনাবর আলি খাঁর কাছে কঠোর তালিম-রেওয়াজও চলছে। প্রথমবার দূরদর্শনের প্রোগ্রামে গাইলাম– রাগ *দেশ*। ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ তখন আমার ঈশ্বর। পাশাপাশি আমার গুরুজীর কথায়সু রে রাগাশ্রয়ী গানের প্রথম রেকর্ড অত্যন্ত সমাদর পাওয়ায় বাংলায় আমার একটা বিশেষ পরিচিতিও শুরু হল। নিয়মিত রেকর্ড বেরনো, অনুষ্ঠান, টিভি ও ছবিতে গাইবার সুযোগ– সবই আসতে লাগল। এমন সময় একদিন রাধুবাবু বললেন, 'কাইল আসিস, তরে মান্নাদার কাছে লইয়্যা যামু।' মনে মনে শিহরিত হলাম। গুরুজী বলতেন–

'গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অতীত গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।'

মান্নাবাবুকে মনে মনে গুরুর আসন দিয়েছিলাম বহু আগেই। তাঁর গান শুনে শিখেছি কিভাবে কথায় প্রাণ সঞ্চার করতে হয়, উচ্চারণের শুদ্ধতা, ইমোশন আরও কত কি? খেয়ালঠুমরী যখন গাওয়ার গেয়েছি কিন্তু যখনই হারমোনিয়াম হাতে গাইতে বসেছি, মান্নাবাবু প্রভাব খাটিয়েছেন অলক্ষ্যে।

তবে কি এবার শিষ্য ও মানসগুরুর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে? হোক, পরের দিন যেখানে রাধুবাবু অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই সেখানে পৌঁছে গেলাম– পাছে দেরী হয়। কিন্তু রাধুবাবুর তো দেখা নেই, প্রায় দু'আড়াই ঘণ্টা হয়– তবু তিনি আসেন না। তখন তো এত ফোনের সুবিধাও ছিল না– তাই উপায়ও কিছু নেই। না! এলেন না রাধুবাবু। আমি মনে মনে ভাবলাম– 'এত দূর যখন এসেছি, যাই একবার মান্না দের বাড়ি – যা হয় হবে।'

পা রাখলাম সিমলে পাড়ার সেই বিখ্যাত বাড়িতে। লম্বা দালান– প্রচুর লোকের ভীড়। প্রায় বেশির ভাগই অনুষ্ঠানের জন্য বায়না করতে এসেছেন। কেউ মেদিনীপুর থেকে তো কেউ ঘাটশিলা, কেউ বর্ধমান থেকে তো কেউ জলপাইগুড়ি। আমি ভয়ে ভয়ে বসলাম সবার শেষে– Last but not the least. মান্নাবাবু তখন মধ্যগগনের সূর্য। সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় আমার পালাও এল। জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ভাই আপনি?' এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল– পাশের বাড়ির ফিয়েস্তা, 'লাগা চুনরি মে দাগ...' শেষে হাত তালির রেশ– ভীড়ে ঠাসা প্যান্ডেলে কোনমতে ঢুকে গান শোনা– 'একী অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়...'। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'আমার নাম অজয় চক্রবর্ত্তী, আমি গান করি, আপনাকে একবার প্রণাম করব বলে এসেছি।' কয়েক সেকেন্ড থমকে গেলেন মান্নাবাবু।

শ্রুতিনন্দনে মান্না দে-র সঙ্গে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী ও তাঁর পিতা অজিত চক্রবর্ত্তী

প্রশ্ন করলেন– 'আপনি কি সেই অজয় চক্রবর্ত্তী যিনি ক'দিন আগে টিভিতে *দেশ* গাইলেন?' মাথাটা নীচু করে বললাম, 'হ্যাঁ'। মান্নাবাবু বললেন, 'দাঁড়ান! ভাবতে হবে, আপনি আমায় প্রণাম করবেন, নাকি আমি আপনাকে প্রণাম করব।' চমকে উঠলাম, লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। উনি বলে চললেন– 'মহারাষ্ট্রে ক্ল্যাসিকাল গানের যা অবস্থা– তাতে অনুষ্ঠান হলে, EXITএই ভীড় হয় বেশি। শুনে রাখুন, আপনি যদি ভারতবর্ষের এক নম্বর গাইয়ে না হতে পারেন তবে I will be the first person to kill you.' একথা বলেই উপস্থিত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের বললেন– 'এঁকে চিনে রাখুন– একটা দিন আসবে যখন আপনারা এঁর date পাবেন না।' মান্নাবাবুর সঙ্গে আমার তেত্রিশ বছর বয়সের ব্যবধান। প্রায় পিতা-পুত্রের বয়সের ব্যবধান। নিজে সঙ্গীত জীবনের মধ্যগগনে থাকাকালীন নিজের পুত্রসম এক শিল্পীকে প্রথম সাক্ষাতে এত বড় আসন দেওয়া কি মুখের কথা? পরবর্তীকালে, বহুবার উনি আমায় বলেছেন– 'সুযোগ পেলে গানটা আপনার কাছে শিখতাম।' আমার নিজের গুণপনা জাহির করছি ভেবে ভুল করবেন না। বলতে পারেন মনটা ঠিক কত বড় হলে– এ কথা সর্বসমক্ষে জোর গলায় বলা যায়? আমার জীবনে এ এক বিরাট শিক্ষা। পুত্রের গুণের কাছে পিতাকেও নতজানু হতে শিখতে হয়। তাতে পিতার আসন নামে না, বরং আরও উঁচুতেই ওঠে। আমরা যদি পরবর্তী প্রজন্মকে সাদরে স্থান করে দিই তাতে আমরাই সমৃদ্ধ হব। মান্নাবাবু এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত।

এরপর থেকে প্রায়শই দেখা হত ওঁর সঙ্গে, কখনো কলকাতায়, কখনো মুম্বইতে বা অন্যত্র। কয়েকটি ঘটনার উলেখ করব– যা মান্নাবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক কেমন ছিল বুঝতে সাহায্য করবে। তখন *সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির* ছোট একটা ঘরে আমি থাকি। সামনে লাগোয়া একফালি বারান্দা। একদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখি সেই বারান্দায় অন্ধকারে এক মহিলা বসে আছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন 'মান্না দে' পাঠিয়েছেন। দেখলাম মান্নাবাবুর সই করা সেই চিঠিতে লেখা–

'অজয়বাবু, এই মহিলা বনশ্রী সেনগুপ্ত। ইনি অত্যন্ত সুরে গান করেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এনাকে গান শেখান তা হলে ইনি উপকৃত হবেন। ইতি মান্না দে।'

বনশ্রীদি সেই সময় যথেষ্ট পরিচিতা। আমি ওঁর ছোট ভাইয়ের মত। কাজেই মান্নাবাবুর অনুরোধ রাখতে পারিনি। আজও বনশ্রীদির সঙ্গে দেখা হলে ঐ দিনের কথা নিয়ে আলোচনা হয়। স্মৃতি সততই সুখের।

মান্নাবাবুর সঙ্গীত জীবনের ষাট বছর পূর্তি অনুষ্ঠান নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আমি গাইছি, 'ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বল না...'। গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো। রাগসঙ্গীতের চর্চার ফসল স্বরূপ আমি সব সময়ই চেয়েছি, পুরনো গানকে নিজের মত করে গাইতে। গুরুদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে যা শিখেছি– যা চিন্তা করেছি– তাতে একই গান রোজ নতুন করে গাইতে চেয়েছি। সেদিনও ঐ গানটি আমি গেয়েছিলাম নিজের মত করেই। গানের পর মান্নাবাবু নিজে এসে বলেছিলেন, 'আমি বহুবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি কি পারতাম এ গান এভাবে গাইতে? উত্তর পেয়েছি, 'না'।' মান্নাবাবুর আমার প্রতি এক অহেতুক স্নেহভালবাসা ছিল – যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

আরেকটি ঘটনার কথা বলি– মান্নাবাবুর জীবন নিয়ে লেখা বই *জীবনের জলসাঘরে* উদ্বোধন হবে বিড়লা সভাগৃহে। উদ্বোধন করতে হবে আমাকেই– এই দাবি নিয়ে বাড়ি এসেছেন *আনন্দবাজারের* শ্রী মানস চক্রবর্তী। বললেন মান্নাবাবুরও একান্ত ইচ্ছে– এ বই আমার হাতেই উদ্বোধন হোক। রাজি হয়ে গেলাম। দিন-ক্ষণ সব লিখেও রাখলাম ডায়েরিতে। অনুষ্ঠানের ঠিক তিন দিন আগে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে অনুরোধ এল দিলিতে আমার আর ওস্তাদ আমজাদ আলি খানের অনুষ্ঠান। আর যে দিন মান্নাবাবুর বই উদ্বোধন– অনুষ্ঠান সেদিনই। প্রেসিডেন্টের অনুরোধ রাখতে পারিনি। মান্নাবাবু আমার কাছে অনেক আগে। যাই হোক পৌঁছলাম অনুষ্ঠানে। শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পি. কে. ব্যানার্জি– আরও কত বিশিষ্ট মানুষ সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আমার আসন ঠিক মান্নাবাবুর পাশেই। জানি না কীভাবে উনি জানতে পেরেছিলেন যে আমি প্রেসিডেন্টের অনুষ্ঠানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য President-কে

মান্নাবাবুর সঙ্গীত জীবনের ষাট বছরপূর্তি অনুষ্ঠান নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আমি গাইছি, 'ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বল না...'। গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো। রাগসঙ্গীতের চর্চার ফসল স্বরূপ আমি সব সময়ই চেয়েছি, পুরনো গানকে নিজের মত করে গাইতে। গুরুদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে যা শিখেছি– যা চিন্তা করেছি– তাতে একই গান রোজ নতুন করে গাইতে চেয়েছি। সেদিনও ঐ গানটি আমি গেয়েছিলাম নিজের মত করেই।

মান্না দে-র সঙ্গে সস্ত্রীক পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী

refuse করলেন?' আমি বলেছিলাম 'President পাঁচ কি বড়জোর দশ বছর থাকবেন। আপনি আমার সারা জীবনের।' উনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে Royal Bengal Tiger তাহলে এখনো আছে?' কথাগুলো কানে এখনও বাজছে। এই অনুষ্ঠানে সকলের বক্তব্যের পর আমায় একটা গান গাইতে বলা হয়। আমার গানের পর মান্নাবাবুর বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হবে। এমনি ঠিক ছিল। আমি গাইলাম আমারই গুরুদেব গুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গান। তাঁর দয়ায় আমি সঙ্গীত বুঝতে শিখেছি– তাঁর শিক্ষায় সবার মধ্যে ভাল খুঁজতে শিখেছি। আমার মানসগুরু মান্না দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এর চেয়ে ভাল কোন ফুল সেদিন আমি আর পেলাম না। 'যদি কণ্ঠ দাও, আমি তোমার গাহি গান...।' সত্যি বলছি, খুব অন্তর থেকে সেদিন আমি চেয়েছিলাম সুরে সুরে আমার সকল গুরুর চরণ ছুঁতে– মান্নাবাবুও তাঁদের একজন। খানিক গাইবার পরেই লক্ষ্য করলাম মান্নাবাবুর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে। শিশুর সারল্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদছেন। গান এক সময় শেষ হল। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পিন পতনের নীরবতা। অদ্ভুত এক পরিবেশ। মান্নাবাবুকে কিছু বলতে বলা হল– বলতে পারলেন না। গলা ধরে এল। অনেক চেষ্টায় আবেগ সামলে বললেন– 'আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সঙ্গীতের আকাশে শ্রী অজয় চক্রবর্ত্তীর নাম যেন সবার উপরে লেখা থাকে।' অর্বাচীন আমি, ধুলোয় আরো মিশে গেলাম।

কলকাতার বুকে ঈশ্বর আমায় দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান করিয়েছেন– *শ্রুতিনন্দন*। ভারতবর্ষের সমস্ত গুরুর সমস্ত ভালকে একত্রিত করে এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি, যার মূল প্রেরণা আমার গুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সেখানে আমার পুত্রকন্যাদের মনেও মান্নাবাবুকে গুরুর আসনেই বসাবার চেষ্টা করেছি। *শ্রুতিনন্দন* ধন্য হয়েছে শ্রী মান্না দের পদধূলি তে। বেশ কিছু সময় তিনি এখানে কাটিয়েছেন। পরমাত্মীয়ের মত কত গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। সমবয়সী বন্ধুর মত আমার বাবামার স ঙ্গে গল্পে মেতেছেন– শিশুর আগ্রহে একাধিক প্রশ্ন করেছেন– আমার ছোটবেলার প্রসঙ্গে– আমার বেড়ে ওঠা প্রসঙ্গে। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন আমার কন্যা কৌশিকীকে। ভালবেসেছেন আমার *শ্রুতিনন্দনের* পুত্রকন্যাদের। এ আমার বিরাট পাওয়া।

ওঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ যখন আমি ব্যাঙ্গালোরে যাই ওঁর বাসায়। *২৪ ঘণ্টা* টিভি চ্যানেলের তরফে Life Time Achievement Award ওঁর হাতে তুলে দিতে। মান্নাবাবু নিজেই চেয়েছিলেন এ Award যাতে আমার হাত থেকে দেওয়া হয়। সে সময় উনি খুব দুঃখ করেছিলেন, বলেছিলেন 'আমি ভাল নেই। আমার আর বাঁচতে ভাল লাগছে না'। শুনে খারাপ লেগেছিল। আমি বলেছিলাম– 'আপনি কলকাতায় চলে আসুন। আমরা সবাই আপনার পাশে আছি। সেখানে মানুষ এখনো আপনাকে সব থেকে বেশি ভালবাসে।' পরে অবশ্য আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে মান্নাবাবুকে *বঙ্গবিভূষণ সম্মান* প্রদান করে এই একই অনুরোধ করেন– 'আপনি কলকাতায় চলে আসুন, দেখবেন ভাল থাকবেন।' তা আর হল না। কোন অজ্ঞাত কারণে বাংলার প্রাণের শিল্পী থেকে গেলেন এমন এক শহরে যেখানে বাংলার কোন সংস্রব তো নেইই, হিন্দির সংস্রবও খুবই ক্ষীণ। মান্নাবাবুর শেষ নিঃশ্বাস বাংলায় পড়ল না– এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, মান্নাবাবুরও দুর্ভাগ্য বটে। এপারওপার দুই বাংলার মানুষের মনে মান্নাবাবুর প্রয়াণে যে আবেগ উথলে উঠেছিল– তাতে একটা মহাকাব্য হয়তো লেখা যেত। মান্নাবাবুর অনেক পাওয়া এই জীবনে হয়তো এইটুকুই না পাওয়া রয়ে গেল।

তাই ওঁর গানের সুরেই বলি–

'...দরদি গো, কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম?'

অনুলিখন **অনল চট্টোপাধ্যায়**

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্ত্তী
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুরু, সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ক'জনা তোমার মত গাইতে জানে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কিছুই ভাল লাগছিল না ২৪ অক্টোবরের পর। হাঁটতে হাঁটতে কত জায়গায় যে তাঁর গান বাজতে শুনলাম। হাঁটার ফাঁকেই আবিষ্কার করা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক উল্টোদিকে, কলেজ স্কোয়ারে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পাশে মান্না দ্বের বিশাল ছবি। বিস্ময়টা প্রথম লাগল তখন। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল পরে। গড়িয়াহাট থেকে শ্যামবাজার, কলকাতার কালীপুজোর সব প্যান্ডেলেও তাঁর বিশাল বিশাল ছবি। এত দ্রুত, কারা এত বড় বড় ছবি আঁকল মান্নার?

শেষ ছয় মাস হাসপাতালে থাকার সময় বেশি কথা বলতে পারেননি মান্না। বড় কষ্টের সব দিন। তাঁর জামাই জ্ঞানরঞ্জন দেবের কাছে শুনেছি, মৃত্যুশয্যায় দুটো কথা অনেকবার বলতেন হিন্দি ও বাংলা গানের সোনার যুগের শেষ সম্রাট, 'আমি তো কারও ক্ষতি করিনি। গান গেয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছি। তা হলে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি কেন?' যখন শুনতেন, অনেক লোক তাঁর জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তখন বলতেন, 'আমি তো তেমন কিছুই করিনি লোকের জন্য। শুধু একটু গান গেয়েছি।'

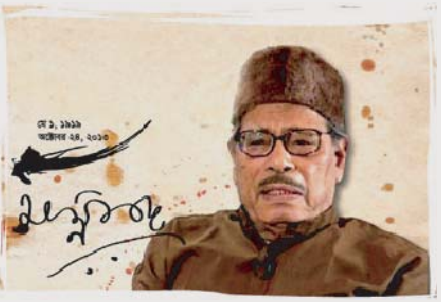

মৃত্যুর পরে মনে হচ্ছে, মান্না নিজের অবদানকে একটু কমিয়েই দেখেছেন। নিউ ইয়র্ক, সিডনি, লন্ডন, ঢাকা, নয়াদিল্লি– সর্বত্র তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন চলছে। প্রেম এবং বিরহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বারস্থ হওয়া যেখানে একটু থামছে, সেখানে মান্না দ্বের জন ্য একটা বিশিষ্ট জায়গা রেখে দিয়েছে বাঙালি। কত প্রেমের গানের লাইন, কত বিরহের গানের লাইন মান্নার জন্য বুকের কাছের হয়ে গিয়েছে বঙ্গভাষী প্রেমিক্ক প্রেমিকার। গঙ্গা ও পদ্মা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরম্নলগীতির মত বাঙালির দুটো প্রাণের

ধারার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে হেমন্ত ও মান্না। শুধু সামগ্রিক জনপ্রিয়তার কথা ধরলে এই বাংলায় উত্তমকুমার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরবর্তী প্রজন্মে মান্নার মত জনপ্রিয় কেউ ছিলেন না। তাঁর শেষকৃত্য কলকাতার বদলে বেঙ্গালুরুতে প্রায় নিঃশব্দে হয়ে যাওয়ায় কত লোককে যে হাহাকার করতে দেখেছি!

তবু মান্না দে কিছুতেই শুধু বাঙালিদের নন।

কলকাতা বা ঢাকার বাঙালিদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয়, তাঁরা মান্নাকে শুধু বাঙালির করে রেখেছেন। তাঁরা সম্মোহিত হয়ে শুনেছেন মান্নার গানের আকাশসমান রেঞ্জ। প্রেমিক, বাউল, মাতাল, ভিখিরি, মস্তান, জমিদার– কত চরিত্র ঝলসে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। ক্লাসিকাল, ওয়েস্টার্ন, কাওয়ালি, ঠুংরি, গজল, টপ্পা, ভজন– কত রকম ধারা উপচে উঠেছে গানে। কিন্তু মান্নার হিন্দি গানের ভা-ার এমনই রত্নখচিত, যা শুনলে বাংলা গানের বৈচিত্র্যকেও খুব হাল্কা মনে হবে। তিনি মারা যাওয়ার পরে চেন্নাইয়ে তামিল ভাষার কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় মান্না দ্রে কে নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন দেখে অবাক এক কলকাতার সাংবাদিক ফোনে বলছিলেন, 'মান্না দে যে দক্ষিণ ভারতে এত জনপ্রিয়, আগে জানতাম না।' শুনে মনে হল, মান্নার স্বপ্ন সাধনা সার্থক। মদন ঘোষ লেনের বাড়ির আড্ডায় কতবার বলেছেন, 'আমি প্রথম থেকে সচেতনভাবে সর্বভারতীয় গায়ক হতে চেয়েছি। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, বাংলা গানের মধ্যে আটকে থাকতে চাইনি।'

জীবন সম্পর্কে এক অসাধারণ কৌতূহলী মন ছিল মান্নার। কত ধরনের যে খবর রাখতেন! একবার কলকাতা বিমানবন্দরে দেখি, বিমান ধরার মুখে বুক স্টলে ঢুকে যাবতীয় ম্যাগাজিন কিনে নিলেন। সব ধরনের খবর রাখতে হবে তো! মেস্সি রোনাল্ডো, মনমোহন্ন শেখ হাসিন্মওবামা, অমর্ত্য সেন্নঅমিতাভ ব চ্চন্নশাহর খ খান, গুগল্লঅ ্যাপল্লব্র্যাকবেরি, রবীন্দ্রনাথ্লনজর ল্ল সেলিম জাভেদ! এত বৈচিত্র্যের স্বাদ তাঁর গানে আছড়ে পড়েছে! তাঁর তিন্নচার টে কথা বুকের মধ্যে গেঁথে বসে আছে। কথা বলাটা ভুল হবে– বলতে পারেন 'বিশ্বাস'।

মান্না দ্রের ওই নিজ স্ব বিশ্বাসগুলি লেখা যায়, যা বারবার বলতেন ব্যক্তিগত আড্ডায়? বিশ্বাস ১: 'আমার বাংলা গানের থেকে হিন্দি গানে অনেক বৈচিত্র্য। বাঙালি মানে না বুঝে হিন্দি গান শোনে বলে ভাল ভাল অনেক গান শোনেইনি।' বিশ্বাস ২: 'মহম্মদ রফি, কিশোরকুমারের পরে সর্বকালের সেরা হিন্দি গায়ক হিসেবে তিন নম্বরে থাকব আমি।' বিশ্বাস ৩: 'আমার বাংলা গানে সেরা হল সত্তর দশকের গান। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের চেয়ে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে সত্তর দশকের গানে। ওই সময়ই আমার গলা সেরা।' বিশ্বাস ৪: 'আমার *সারা বছরের গান* অ্যালবাম বাংলা গানে সেরা। এমন বৈচিত্র্য কম গানে আছে।' বিশ্বাস ৫: 'পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশের লোকেরা অনেক মন দিয়ে বাংলা গান শোনে। আমার পরের দিকের অনেক গান কলকাতা হয়তো শোনেনি, কিন্তু ঢাকার লোকেরা মনে রেখে দিয়েছে। অনেক ভাল গানের ঢাকার ফাংশানে অনুরোধ এসেছে, কলকাতায় আসেনি। কলকাতা একই রকম গান শুনে গিয়েছে।' বাংলাদেশের শ্রোতাদের কথা তুললে মান্না বিশেষ করে এপিটাফ গানের কথাটা বলতেন, যা ওখানকার শ্রোতারা বারবার শুনতে চাইতেন। 'যে সমাধি বেদিটার ঠিক ওপরে ফুলন্ত গাছটা পড়েছে নুয়ে/ ওখানে যে রয়েছে শুয়ে/ তার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি।'

কী নতুন স্টাইল মান্না দে যোগ করেছেন তাঁর গানে, যা আগে শোনা যায়নি? মান্না মানেই যে বৈচিত্র্য, সঙ্গীতপ্রেমীরা জেনে গিয়েছেন এতদিনে। কিন্তু মান্নার স্টাইলকে অনন্য করে গিয়েছে তাঁর নাটকীয়তা, উচ্চারণ, স্মার্টনেস। একটা স্টাইলের নদী থেকে অবলীলায় সম্পূর্ণ অন্য স্টইলের নদীতে চলে যাওয়া।

'তুই কি শুধু খোট্টাদের জন্যই গান গাইবি', মার কথায় মান্না ১৯৫৩ থেকে বাংলা গান শুরু করেছিলেন, হিন্দি গান গাওয়ার এক যুগ বাদে। ষাট দশক পর্যন্ত তিনি যে ধরনের বাংলা গান গেয়েছেন, তা চিরাচরিত বাংলা গানের ধারার সঙ্গেই মেলানো যায়। সুরে, কথায়, গাওয়ার ভঙ্গিতে। তার পর থেকেই তিনি সুরে সর্বভারতীয় গানের স্টাইল মিশিয়েছেন। কাওয়ালি, গজল, নগমা, রাজস্থানি, গুজরাতি গানের ধারা মিশিয়ে পরিয়ে দিয়েছেন নতুন গয়না। এত নাটকীয়তা, বৈচিত্র্য তাঁর আগের বা সমসাময়িকরা কেউ জুড়তে পারেননি বাংলা গানে। এক একটা গান এক স্টাইলে। কেন এমন বৈচিত্র্য? মান্না সব সময় সময়ের সঙ্গে চলতে চেয়েছেন। 'সময় বড়া বলবান' কথাটা বারবার বলতেন। আর ভালবাসতেন, তাঁর চেয়ে অনেক ছোটদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। যাতে নতুন প্রজন্মের চাহিদা জানতে পারা যায়।

বয়স যাঁদের ষাট থেকে সত্তর, সেই শ্রোতারা মনে করেন, তাঁর পাঁচ ও ছয়ের দশকের বাংলা গানই সেরা। চল্লিশ্লপ ঞ্চাশের কাছাকাছি শ্রোতার কাছে মান্নার সেরা গান আবার সত্তর্লআশির দশ কের। আধুনিক গানে প্রেমের সম্রাট ধরা হয় তাঁকে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, প্রেমের গানের বাইরে কত রকম গানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছেন তিনি। 'কফি হাউস', 'ছোট বোন', 'সারা বছরের গান', 'সারা জীবনের গান', 'মা আমার মা', 'নীলাম নীলাম', 'দশ বছরের বংশি মুচির ছেলে', 'স্কুল মাস্টার', বাংলাদেশ নিয়ে 'সেই ঢাকা মেল নেই তো আর', 'আমার প্রিয় মনীষী', 'বাব্বা মেয়ের গান', কলকাতা নিয়ে 'আমি দেখেছি', কাকাকে নিয়ে 'ঠিক ছবির মতো'। সলিল চৌধুরীর সুরে রাজনৈতিক স্যাটায়ার 'আমি রাজনীত্তিটাজনীতির ধার ধারি না', গণসঙ্গীত 'ও আলোর পথযাত্রী', 'মানব না বন্ধনে' শুনলে জীবনমুখী গানের পূর্বসুরীদের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে

বয়স যাঁদের ষাট থেকে সত্তর, সেই শ্রোতারা মনে করেন, তাঁর পাঁচ ও ছয়ের দশকের বাংলা গানই সেরা। চল্লিশ্লপ ঞ্চাশের কাছাকাছি শ্রোতার কাছে মান্নার সেরা গান আবার সত্তর্লআশির দশকের। আধুনিক গানে প্রেমের সম্রাট ধরা হয় তাঁকে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, প্রেমের গানের বাইরে কত রকম গানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছেন তিনি।

দারুণভাবেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সলিলের লেখা সুরে মান্না ও সবিতা চৌধুরীর গাওয়া 'এই দেশ এই দেশ' এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' তো রেডিওতে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে যায় যে, জাতীয় সঙ্গীতের মত মনে হত। হেমন্ত্মর সুরে 'ও কোকিলা তোরে', মানবেন্দ্রর সুরে 'কেন ডাকো মিছে পাপিয়া', শ্যামলের সুরে 'এত পুতুল খেলা নয়', সতীনাথের সুরে 'অকুল গাঙের মাঝি রে ভাই'– এক একটা গান এক এক ধারার। ঠিক যে ভাবে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী' শুনে সাগর সেনের মত শিল্পী ছাত্রদের বলেছিলেন, 'উনি শিল্পীদের শিল্পী বলে এভাবে গান গাইতে পেরেছেন।' ঠিক যে ভাবে তাঁর গাওয়া নজরুলগীতি, 'শাওন রাতে যদি', 'যেদিন লব বিদায়', 'সেকি তুমি', 'ভুলি কেমনে' শোনার পরে অন্য কণ্ঠে সে গান শুনতে ভাল লাগত না।

মান্না প্রয়াণের পরে বাংলা কাগজ্মপি ত্রিক্মটিভি তে মান্না চর্চার মধ্যে দুটো বাংলা গান বেশি ঘুরে ফিরে আসছে। 'কফি হাউস' এবং 'কে তুমি নন্দিনী'। যেন এর বাইরে মান্নার কোনও জনপ্রিয় গান নেই। এটা অবশ্য শেষ বছরপাঁচেক হলই দেখেছি। মান্নাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে বলতেন, 'ছেড়ে দাও! ও সব ভেবে কী হবে আর?' পরে বলতেন, 'এখন লোকে একই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনে।'

এই একই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনার ব্যাপারটা কি হিন্দি গানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? ইন্টারনেট সার্চ দিলেই মান্না দ্ের গান নি য়ে যে আলোচনা চলছে, সেখানে অধিকাংশ গানই চেনা। 'লাগা চুনরি মে দাগ', 'পুছো না ক্যায়সে', 'জিন্দগি ক্যায়সি হ্যায় পহেলি', 'এ ভাই জরা দেখকে চল', 'অ্যায় মেরি জোহরা জবিন', 'অ্যয় মেরে প্যায়ারে ওয়াতন', 'প্যায়ার হুয়া ইকরার হুয়া', 'ইয়ে রাত ভিগি ভিগি', 'ঝনক ঝনক তোরি', 'কৌন আয়া মেরে মন কে', 'এক চতুর নার', 'ইয়ে দোস্তি হাম নহি', 'চলত মুসাফির', 'তু প্যায়ার কা সাগর', 'ইয়ার হ্যায় ইমান', 'সুর না সজে', 'ফুল গেন্দোয়া না মারো', 'উপর গগন বিশাল', 'আও টুইস্ট করে', 'আজা সনম মধুর', 'দিল কা হাল শুনে দিলওয়ালা', 'ছম ছম বাজে', 'মুড় মুড় কে না দেখ', 'দিল কি গিরাহ খোল দো', 'তেরে নয়না তলাশ', 'কিসনে চিলমন সে মারা', 'তুঝে সুরজ কহু ইয়া চন্দা', 'কসমে ওয়াদে প্যায়ার'।

এ সবের বাইরেও মান্নার যে অসাধারণ সমস্ত হিন্দি গান রয়েছে অনেকে খোঁজই নেন না। ফিল্মের গান, নন্নফি ল্মের গান। ক্লাসিক, কমেডি, পপ, কাওয়ালি সব মিলেমিশে একাকার সেখানে। কী করে ভুলি, ক্লাসিকাল হিন্দির শেষ কথা 'রে মন সুর মে গা', 'রাগমালা' বা 'ভোর আয়ি গয়া আন্ধিয়ারা'? ভীমসেনের সঙ্গে 'কেতকী গুলাব জুহি'? কী করে ভুলি হিন্দি গানের অন্য দুই সেরা কাওয়ালি 'ইস্ক ইস্ক ইস্ক' বা 'জালিম মেরি শরাব মে' বা 'ইয়ার হ্যায় ইমান'? বাউলাঙ্গের হাহাকার ভরা গান 'দুর হ্যয় কিনারা' বা 'নদীয়া চলে চলে রে ধারা'? পরিচিত ঠুংরিকে কমেডি করে দেওয়া 'আরে হঠো কাঁহে কো' বা 'প্যায়ার কি আগ মে'? রবীন্দ্রসঙ্গীত মিশিয়ে হিন্দি গান? নন্নফিল্ম সব অসাধারণ ভাণ্ডার 'মেরি ভি ইক মমতাজ থি', 'নথলি সে টুটা মোতি রে', 'নাচ রে ময়ুরা', 'পল ভর কি পহেচান'? লিখতে লিখতে মনে হয়, আরে, অনেক গানের কথা তো বাদ পড়ে গেল!

এত গান গাওয়ার পরেও মান্না দে কি উপেক্ষিত ছিলেন? এই প্রশ্নটা তাঁকে করে দেখেছি, মুড ভাল থাকলে তিনি বলতেন, 'সব সুরকারের সুরে তাদের সেরা গান গেয়েছি। দিলীপকুমার বাদে সব নায়কের লিপে গান গেয়েছি। কিসের আক্ষেপ আমার?' মুড খারাপ থাকলে বলতেন, 'আরও ভাল গান গাইতে পারতাম। সব ভাল গান তো কিশোর, রফি পেয়ে গেল!' যে লোক হিন্দিতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি গান করেছেন, গান করেছেন অসংখ্য ভাষায়– এত এত গান, এত নায়কের লিপে গান। কী করে মান্না দ্ে কে উপেক্ষিতর দলে রাখবেন? কোনওমতেই তিনি উপেক্ষিত হতে পারেন না। মান্নার হিন্দি গানের বিশেষত্ব হল, যা তাঁর সীমাবদ্ধতা, সেটাই আকাশছোঁয়া কৃতিত্ব। মান্নার গান হিট করানোর জন্য সুন্দর মুখের নায়ক দরকার হয়নি। সাইড রোলের অভিনেতার গানও মান্না হিট করিয়েছেন বলে বলে। ফ্লপ সিনেমায় হিট গান দিয়েছেন। একটা সিনেমায় হয়তো একটা গান গেয়েছেন– সেটাই হিট হয়ে গিয়েছে। মান্নাকে এ কথা বললে হাসতেন খুব।

মান্না রবং উপেক্ষিত ছিলেন তাঁর জন্মভিটেতেই। শ্রোতারা তাঁর গান প্রাণ ভরে শুনেছেন। একানব্বই বছরেও তাঁর শেষ অনুষ্ঠানে উপচে পড়েছিল মানুষ। কিন্তু টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে কী দিয়েছে? মান্না দে ভারতীয় ফিল্মের সেরা পুরস্কার *দাদা সাহেব ফালকে* পাওয়ার পরেও বাংলা সিনেমার কলাকুশলীর তরফে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়নি সেভাবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দূরে থাক। মান্না দুঃখ করতেন, 'অমিতাভ থেকে লতা, বোম্বের সবাই ফোন করেছিল। কলকাতার কেউ তো ফোন করল না। তাঁর প্রয়াণের পরেও নিউইয়র্ক, ঢাকা, সিডনি, মুম্বই, বেঙ্গালুরম্ন– সর্বত্র স্মৃতি অনুষ্ঠান হয়েছে। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায়ও মান্না স্মরণ হয়েছে। টালিউড ইন্ডাস্ট্রির তরফে কোথায় কী হল?

হিন্দি গানে মান্না রোমান্টিকতার অভাবে মার খেয়েছেন, এই কথাটা অনেককে বলতে শুনছি আজকাল। খেয়াল করে দেখুন, হিন্দি গানের দু'টি সেরা রোমান্টিক ডুয়েট মান্নারই গাওয়া। 'প্যায়ার হুয়া ইকরার হুয়া' এবং 'ইয়ে রাত ভিগি ভিগি'। তিনি রোমান্টিকতার সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছেন বাংলা সিনেমায় গাইতে এসেও। উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি পাল্টে দিতে সাহায্য করেছেন।

মান্না প্রয়াণের পরে বাংলা কাগজ্মপি ত্রিক্মটিভি তে মান্না চর্চার মধ্যে দুটো বাংলা গান বেশি ঘুরে ফিরে আসছে। 'কফি হাউস' এবং 'কে তুমি নন্দিনী'। যেন এর বাইরে মান্নার কোনও জনপ্রিয় গান নেই। এটা অবশ্য শেষ বছরপাঁচেক হলই দেখেছি। মান্নাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে বলতেন, 'ছেড়ে দাও! ও সব ভেবে কী হবে আর?' পরে বলতেন, 'এখন লোকে একই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনে।'

মান্না দের গান গাওয়ার এই আকুতি তাঁকে নিয়ে জলসায় গাইয়ে নিত তিন ঘণ্টা। জলসার গানকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন মান্না। বাংলায় কথা বলতে বলতে, আড্ডার মেজাজে গান গাওয়ার প্রচলন মান্নার হাত ধরেই। সমসাময়িকদের থেকে বয়সে বড় হলেও তাঁর কণ্ঠস্বরে জরা স্পর্শ করেছে বহুদিন পরে। প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাঁর সব প্রেমের গানের উৎস স্ত্রী সুলোচনা প্রয়াত না হলে হয়তো আরও বেঁচে থাকতেন মান্না।

গানের মহড়ায় সুরকার মদনমোহন ও শিল্পী মহম্মদ রফির সঙ্গে মান্না দে

বাংলা ছবির সেরা দুটো রোমান্টিক গান বলতে অনেকেই তুলবেন, 'কে প্রথম কাছে এসেছি' এবং 'হয়তো তোমার জন্য'। মান্নাকে দেখতাম, প্রথম গানটার জন্য বেশ গর্ব নিয়ে কথা বলতেন। কী ভাবে লতার সঙ্গে সুরের লড়াই করেছিলেন, বোঝাতেন। এই গর্বটা লেগেছিল আরও দুটো ডুয়েটের জন্য। দুটোই হিন্দি। লতার সঙ্গে 'শোচ কে ইয়ে গগন ঝুমে' এবং আশার সঙ্গে 'রে মন সুর মে গা'। দুই বোনের সঙ্গে সব মিলিয়ে আড়াইশোর বেশি ডুয়েট রয়েছে তাঁর। এই দুটোকেই সেরা ধরতে দেখেছি এত গানের মধ্যে। মান্না দের আর একটা মাইলফলক হল, নব্বই পেরিয়েও গান গেয়ে যাওয়া। গান গাওয়ার এই আকুতি তাঁকে নিয়ে জলসায় গাইয়ে নিত তিন ঘণ্টা। জলসার গানকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন মান্না। বাংলায় কথা বলতে বলতে, আড্ডার মেজাজে গান গাওয়ার প্রচলন মান্নার হাত ধরেই। সমসাময়িকদের থেকে বয়সে বড় হলেও তাঁর কণ্ঠস্বরে জরা স্পর্শ করেছে বহুদিন পরে। প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাঁর সব প্রেমের গানের উৎস স্ত্রী সুলোচনা প্রয়াত না হলে হয়তো আরও বেঁচে থাকতেন মান্না। শরীর অশক্ত হয়ে এলেও স্মৃতি ছিল অসাধারণ। গত জানুয়ারিতে শেষ যে দিন বেঙ্গালুরুর বাড়িতে দেখা হয়েছিল, সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, *'ফুল না হয়ে কাঁটা হয়ে বেশ ছিলাম* গানটার আগে প্রিলুডটা কোথা থেকে এল?' ওয়েস্টার্ন ও বাউলাঙ্গ মিশিয়ে তৈরি গানটাকে মজা করে 'ইংলিশ ভাটিয়ালি' বলতেন মান্না। সেদিনও সেই কথাটা বলে মন্তব্য করেছিলেন, 'রাজ কাপুরের লিপে *দিল কা শুনে দিলওয়ালা* গানটার ইন্টারল্যুডে চুচুক চুচুক আওয়াজটা ভেবে বাংলা গানে লাগিয়েছিলাম।'

জীবনকে ভালবাসতেন বড়। পঁচাশি পেরিয়েও সঙ্কোচহীন গলায় প্রেমের গান গেয়েছেন, 'ও হাসিনা, আমি কি তোর এতই অচেনা/ তাকাস যখন আগের মত, দুহাতে চোখ ঢাকিস তখন/ কিছুই কি তোর মনে পড়ে না?' বলতেনও, 'আমার মনের বয়স বাড়েনি।' শিল্পীর জীবনে সৃষ্টি থেমে থাকে না, এই ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখনও যে লোকে আমার গান শুনতে আসছে, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কেন তাদেরকে বঞ্চিত করতে যাব?'

নব্বইয়েও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বাজার করতে। নতুন গান, সিনেমা নিয়ে ডুবে যেতে পারতেন আড্ডায়। শেষদিকটায়, দৃশ্যটা চোখে ভাসলে বুক কেঁপে ওঠে। ক্যাথিডার লাগানো, ওয়াকার নিয়ে হাঁটছেন। ওই অবস্থায় নিজেই বালতি ওয়াকারে লাগিয়ে চলে যেতেন বাথরুমে। নিজের জামা নিজে কাচবেন বলে। পারতেন না অনেক সময়। বাথরুমে পড়ে যেতেন। তবু কাউকে ডাকবেন না– এমন আত্মমর্যাদাবোধ। 'নিজের কাজ অন্যকে করতে দেব কেন', কতবার যে বলেছেন! ক্যাথিডার পরে থাকার জন্য বাইরে বেরোতে চাইতেন না। ফোনে বলতেনও, আমাকে দেখতে এসো না। কষ্ট পাবে। আমার চেহারাটা খুব ভেঙে গিয়েছে।' আবার সামান্য বাদেই হয়তো বাইরে যাওয়ার জন্য, ফাংশানে গাওয়ার জন্য অসম্ভব আকুতি। কী যে আকুতি ছিল স্ত্রীর জন্য প্রেমের গানটা রেকর্ড করার।

মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণচন্দ্র দে মান্নার গাওয়া 'ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি' শুনতে চাইতেন। গানটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তিনিও শুনেছি, মৃত্যুশয্যায় ওই গানটাই শুনতে চাইতেন। মান্না নিজে ওই গানটা ফাংশানে গাইলে চোখের জলে ভাসতেন। কিন্তু বেঙ্গালুরুর বাড়িতে রোগশয্যায় শুয়ে প্রেমের গান গেয়ে গিয়েছেন বারবার। তাঁর স্ত্রীর জন্য তৈরি যে সব গান। তাঁর প্রেমের পুরনো গান– যে গানের প্রথম শ্রোতা ছিলেন তাঁর স্ত্রীই।

মান্না দে চলে গিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বেঁচে থাকবেন অসংখ্য মানুষের প্রেমে, বিরহে, শোকে ও আনন্দে। বেঁচে থাকবেন জম্মুকাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি, আমেদাবাদ থেকে ঢাকা, সিডনি থেকে সানফ্রান্সিসকো। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এখন তাঁর কোনও না কোনও গান বাজছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য ভারতের সাংবাদিক, মান্না দের জীবনীকার

আসল ট্রফি

আসছে

বাংলাদেশ-এ

ডিসেম্বর ২০১৩

FIFA WORLD CUP™ TROPHY TOUR by Coca-Cola

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সোনালি বিকেলগুলো

ইমদাদুল হক মিলন

গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডে মায়ের মামাবাড়ি। ঢাকায় আমার নানাবাড়ি, বলতে ওটাই। বিক্রমপুরের মেদিনীম-ল গ্রামে মায়ের বাপের বাড়ি। সেই বাড়িতে নানীর কাছে ছেলেবেলার অনেকগুলো দিন কেটেছে। নানীর কাছে থেকে পাশের গ্রাম কাজির পাগলার এ টি ইনস্টিটিউশনে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। এ টি হচ্ছে অভয় তালুকদারের সংক্ষেপ। তিনি ছিলেন এলাকার জমিদার। একশো দশ বছর আগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে এসেছিলেন তালুকদার মহাশয়ের নাতনী বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী দিপালী নাগ। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কণ্ঠের দীপ্তিতে অবাক হয়েছিলাম।

বিক্রমপুরে গান-বাজনার ভাল চল ছিল। যাত্রাপালা-শরিয়তি-মারফতি ইত্যাদি যেমন ছিল, পাশাপাশি ছিল আধুনিক হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয় আধুনিক বাংলা গান। সচ্ছল বাড়িতে রেডিও ঢুকে গেছে। কোনও কোনও বাড়িতে আছে গ্রামোফোন। আমরা বলতাম 'কলের গান'। পেতলের লম্বা চোঙাঅলা। ৭৮ আর পি এমের পাথর কেটে তৈরি করা ভারি ভারি রেকর্ড। রেকর্ড রাখার টিনের বাক্স, ছোট সুটকেসের মত। পিনের বাক্সও ছিল সুন্দর। ও-রকম পিনের খালি বাক্সের ভীষণ লোভ ছিল আমার। পুরো ছেলেবেলা কেটেছে একটা বাক্সের আশায়। জোগাড় করতে পারিনি।

আমার নানারা ছিলেন তিনভাই। আমার নানা বড়। তাঁর সংসারে দুই মেয়ে। মেজনানা ছোটনানার ঘরে অনেক ছেলেমেয়ে। সেই বাড়িতে প্রথম রেডিও কিনলেন আমার বাবা। মারফি কোম্পানির রেডিও। সেই রেডিও শোনার জন্য পাড়ার লোক ভিড় করত। উঠোনের মাঝখানে কাঠের চেয়ারের ওপর রেডিও, চারপাশে ভিড় করা মানুষজন। আমরা ছোটরা মুগ্ধ হয়ে রেডিওর দিকে তাকিয়ে আছি। আকাশবাণী কলকাতা, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা, কী সুন্দর সুন্দর গান, যন্ত্রসঙ্গীত, খবর, কথিকা।

বিগত শতকের ৬০ সালের শুরুর দিককার কথা। তখনও পর্যন্ত আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মানে গানের ভেতরকার বাণীসুরগায়কী কে কীভাবে গাইছেন ইত্যাদি বুঝে উঠতে পারছি না। শুধুই শুনে যাচ্ছি, শুধুই মুগ্ধ হচ্ছি। *আকাশবাণী কলকাতায় অনুরোধের আসর* হয়। কত শিল্পীর কত মনমাতানো গান। আমরা দলবেঁধে অপেক্ষা করি কখন শুরু হবে অনুরোধের গান। কখন শোনা যাবে শ্রোতাদের *অনুরোধের আসর*। শুরুর দিকে একটু কম জনপ্রিয় শিল্পীদের গান। যেমন পিন্টু ভট্টাচার্য্য, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, বনশ্রী সেনগুপ্ত। ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তম শিল্পীদের দিকে যায় অনুষ্ঠান। আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁশলে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর। কখনও কখনও অমল মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান 'এই পৃথিবীতে সারাটি জীবন কী পেলাম বলো হায়' অথবা 'চুপ চুপ লক্ষ্মীটি শুনবে যদি গল্পটি'। পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা শ্যামাসংগীত 'মা আমার সাধ না মিটিল'। এই গান আমরা সবাই প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের একটা গানের কথা মনে পড়ে 'জল ভর কাঞ্চনকন্যা জলে দিয়া মন'। ছেলেবেলায় শোনা সেই গান বহু বছর পর শুনেছিলাম সাতক্ষীরার পারুলিয়ায় গিয়ে। পারুলিয়ায় আমার বিখ্যাত বন্ধু আফজাল হোসেনের বাড়ি। আশির দশকে গেছি সেই বাড়িতে। আফজালের একমাত্র বোন রন্নমা গ্রামোফোনে প্রতিদিন ওই রেকর্ডটা চাপাত। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম, শুনতে শুনতে চলে যেতাম পেছনে ফেলে আসা সোনালি দিনে।

পিন্টু ভট্টাচার্য্যের গান শুনলেই মনে হত পাশের বাড়ির ছেলেটি নির্জন দুপুরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছে। 'এক তাজমহল গোড়ো, হৃদয়ে তোমার আমি হারিয়ে গেলে' অথবা 'চলো না দীঘার সৈকত ছাড়িয়ে'। বনশ্রী সেনগুপ্তের 'হৃদয় আমার সুন্দর তব পায়' কী জনপ্রিয় গান! তালাত মাহমুদের বাংলা গান 'এই তো বেশ এই নদীর তীরে বসে গান শোনাই' গানটির মধ্যে নদীজলের ছলাৎ ছলাৎ একটা শব্দ ছিল। সেই বয়সে যন্ত্রের ওইটুকু কারুকাজ আমাদের কাছে বিস্ময়কর। মহম্মদ রফির একটা আধুনিক বাংলা গানের কথা মনে আছে 'ওই দূর দিগন্ত পারে, যেথা আকাশ-মাটিতে কানাকানি, তোমার আমার শুধু তেমনি করে জানাজানি'।

তখনই সিনেমায় বিখ্যাত হয়েছেন আজকের হার্টথ্রব নায়ক প্রসেনজিতের বাবা বিশ্বজিৎ। বাংলা হিন্দি সিনেমার জগতে সুদর্শন নায়ক হিসেবে খ্যাতিমান। গানও করতেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয় গান ছিল 'যায় যায় দিন, বসে বসে দিন, জানি না এখন রাত কীবা দিন'। এরকম আরও কত শিল্পীর কত গান, সব মনেও নেই এখন।

'পাঁচমিশালী গানের অনুষ্ঠান' নামে একটা অনুষ্ঠান হত *আকাশবাণী*তে। সেই অনুষ্ঠানও পাগলের মত শুনতাম আমরা। শচীন দেববর্মণ আর তাঁর যোগ্য পুত্র রাহুল দেববর্মণ, পিতাপুত্র দু'জনই বিখ্যাত। পিতা তখনই কিংবদন্তি, পুত্র ধীরে ধীরে পিতার পথে এগুচ্ছেন। শচীনকর্তার গানের মাহাত্ম্য, সুরের খেলা আর জাদুকরী কণ্ঠমাধুর্য তখনও ধরতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝি, তাঁর গান শুনলে হৃদয় তোলপাড় করে। মন অন্যরকম হয়ে যায়। কেন হয় সেই রহস্য ধরতে পারি না। 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া, আমার ভাইধনরে কইও নাইওর নিতো আইয়া' শুনলে ওই বয়সেই চোখের সামনে দেখতে পাই নদীতীরে শ্বশুরবাড়িতে বছর ধরে পড়ে আছে বাংলার এক বোন। নদীর দিকে তাকিয়ে মাঝিমাল্লাদের কাছে সে অনুরোধ করে তার ভাইকে খবর দেওয়ার জন্য। এই বাড়িতে এসে বোনকে যেন সে নাইওর নিয়ে যায়। বছরখানেক ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়া হয় না তার।

পরবর্তী জীবনে শচীনদেব আমাদের প্রিয়তম শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

এই লেখায় আমি শুধু বাংলা গানের কথাই বলছি, প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি হিন্দি গানের উদাহরণ আসতে পারে। শচীনকর্তা আর রাহুল দেববর্মণের হিন্দি গানের জগৎ মাতিয়ে দেওয়ার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুরকার হিসেবে তাঁরা কিংবদন্তি। শচীনকর্তার কণ্ঠে *গাইড* সিনেমায় একটুখানি 'আলাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তু রামা' একেবারেই অন্যরকম একটা তাৎপর্য দিয়েছিল। আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুরের *অমর প্রেম*, পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি, শচীনকর্তা 'ও মাইয়া রে' বলে যে একটুখানি টান দিয়েছিলেন, এখনও সেই সুর আমার হৃদয়ে। মনে আছে, আমি কেঁদেছিলাম।

রাহুল দেববর্মণের 'মনে পড়ে রুবি রায়' আমাদের কৈশোরকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সতীনাথের 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার', 'আকাশ এত মেঘলা যেও নাকো একলা' এইসব গান কী করে ভুলি! অপরেশ লাহিড়ী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কত মহান শিল্পী প্রায় একই সময়ে এসেছিলেন বাংলা গানের জগতে। আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আলীম, ফেরদৌসী বেগম (পরে রহমান), ফরিদা ইয়াসমিন আরও পরে নিলুফার ইয়াসমিন, আব্দুল জব্বার, মাহমুদুন্নবী, রুনাসাবিনাশাহনাজ, কত শি ল্পীর কথা বলব! সব মিলিয়ে বাংলা গানের রমরমা দিন ষাটস ত্তরের দশক।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত কত বিখ্যাত গান। 'মনে আগুন জ্বলে, চোখে কেন জ্বলে না' অথবা 'একটা গান লিখ আমার জন্য' অথবা 'জলে ভাসা পদ্ম আমি' অথবা 'আমি মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি'। আরতির 'যদি আকাশ হতো আঁখি, তুমি হতে রাতের পাখি'।

না, গানের কথা বলতে বলতে আমি আজ খেই হারিয়ে ফেলছি। মান্না দে-কে নিয়ে লিখতে বসে কোথায়, কতদূরে চলে যাচ্ছি। তবু আর দু'একটা প্রসঙ্গ বলে মান্না দের দি কে যাই।

মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি' অথবা 'ময়ূরকণ্ঠী রাতের নীলে' অথবা 'ভুলে গেছি কবে সেই পথে যেতে তুমি ছিলে মোর পাশে'। শ্যামল মিত্রের অজস্র জনপ্রিয়, ব্যাপক জনপ্রিয় গান। যেমন 'ভ্রমরা ফুলের বনে', 'কার মঞ্জির বাজে', 'চোখের নজর কম হলে', 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা'– রমাপদ চৌধুরীর প্রথম দিককার উপন্যাস *দ্বীপের নাম টিয়ারঙ*এর বিখ্যাত গান 'আমি চান্দের সাম্পান' শুনে শুনে আমাদের দিন কাটত। আহা কোথায় হারিয়ে গেল গানে গানে ভরে থাকা সোনালি বিকেলগুলো।

আরও কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর গানের কথা মনে পড়ছে। জগন্ময় মিত্রের 'তুমি আজ কত দূরে', সুবীর সেনের 'এত সুর আর এত গান', তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাজল নদীর জলে', সুমন কল্যাণপুরের 'মনে কর আমি নেই বসন্ত এসে গেছে', নির্মলা মিশ্রের 'ও তোতা পাখি রে', গীতা দত্তের 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার' অথবা 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়' কী যে বিখ্যাত হয়েছিল বলে শেষ করা যাবে না।

তখনকার দিনে সবচাইতে জনপ্রিয় সঙ্গীতজুটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সিনেমায় যেমন

এই লেখায় আমি শুধু বাংলা গানের কথাই বলছি, প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি হিন্দি গানের উদাহরণ আসতে পারে। শচীনকর্তা আর রাহুল দেববর্মণের হিন্দি গানের জগৎ মাতিয়ে দেওয়ার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুরকার হিসেবে তাঁরা কিংবদন্তি। শচীনকর্তার কণ্ঠে গাইড সিনেমায় একটুখানি 'আলাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তু রামা' একেবারেই অন্যরকম একটা তাৎপর্য দিয়েছিল।

উত্তমসুচি ত্রা, গানে তেমন হেমন্তস ন্ধ্যা। বাংলা গানের জগৎ ছেড়ে হেমন্ত এক সময় মুম্বইতে, তখনকার বোম্বাইতে পাড়ি জমালেন। *নাগীন, ষোলাসাল* ইত্যাদি সিনেমায় সুর করে, গান গেয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে চলে গেলেন। *নাগীনে*র মিউজিক আজ প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে সমান জনপ্রিয়। লতার 'মন ডোলে মেরা তন ডোলে'র জনপ্রিয়তা একবিন্দুও ম্লান হয়নি। *ষোলাসাল* সিমেনায় হেমন্তের 'আয় আপনা দিল তো আওয়ারা' সেই সময়কার সব শ্রেণীর মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। আর আধুনিক বাংলা গানে হেমন্ত, হেমন্তের এক নীল আকাশ। স্নিগ্ধ স্বচ্ছ মায়াবী। তাঁর গানের শ'খানেক উদাহরণ আমি এখনই দিতে পারি, যেগুলো জনপ্রিয়তায় আকাশ স্পর্শ করেছে। আমার ছেলেবেলা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল হেমন্তের একটি গান 'ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলো'। এখনও হেমন্তের যে-কোন গান আমাকে সেই ছেলেবেলার মতই মুগ্ধ করে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়েরও স্মরণীয় গান প্রচুর। 'মধু মালতী ডাকে আয়', 'চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী', 'জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া'। কী অসাধারণ মিষ্টি কণ্ঠ। শুনলে এই বয়সেও পাগল হয়ে যাই।

নিজের উপন্যাস *রাইকমল* সিনেমা হচ্ছে– বাংলা উপন্যাসের তিন সম্রাটের একজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সিনেমার জন্য লিখলেন অবিস্মরণীয় গান। সন্ধ্যার কণ্ঠে এই গান নিয়ে এল পূর্ণিমা সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা। 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে' শুনলে এখনও মনে হয় দূরের কোন কদমতলা থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি এক বাঁশীর সুর।

মান্না দে-কে আবিষ্কার করতে আমার একটু সময় লেগেছিল। *আকাশবাণী কলকাতা*র অনুরোধের আসরে তাঁর গান শুনতাম, মামাবাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনতাম কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না কেমন লাগে তাঁর গান। একটু ওস্তাদি ঢং, কণ্ঠে একটু অন্যরকম কারুকাজ, একদম দরাজ খোলা গভীর পৌরুষমাখা কণ্ঠ। অন্য কারও সঙ্গে মেলে না। একেবারেই অন্যরকম। যতদূর মনে পড়ে, প্রথম তাঁর গান শুনলাম 'তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়, তারই মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর'। শুনতে শুনতে মুখস্থ করে ফেললাম। বন্ধুরা একসঙ্গে হলেই যে যার মত করে গাই। সুর ঠিক হয় না, তাল ঠিকের তো প্রশ্নই ওঠে না। গেয়ে যাই যে যার মত।

গেন্ডারিয়াতে আমরা কয়েক বন্ধু তখন স্কুলের পর একসঙ্গে আড্ডা দিই। মুকুলমান বেন্দ্রবুলুসুভাষবজলুইসরাজুলহামিদুল- বেলাল। শীতকালে মানবেন্দ্রদের পুরনোকালের বিশাল বাড়ির মাঠের মত উঠোনে ব্যাডমিন্টন খেলি, পূর্ণিমা সন্ধ্যায় ওদের ছাদে বসে আড্ডা দিই। লেখাপড়া ফেলে চাঁদনি রাতে আড্ডা দেওয়া আমাদের প্রিয় অভ্যাস। কখনও বুলুদের পোস্তগোলার বাড়িতে চলে যাই। রেল লাইনের ধারে খোলামেলা বাড়ি। চাঁদ দেখা যায় পরিষ্কার। আমরা আড্ডা দিই, গান গাই। মাবাবা তেমন শাসন করেন না। গেন্ডারিয়া হাই স্কুলের এই দলটি ছাত্র হিসেবে ভাল। এক থেকে দশের মধ্যে এরাই। সুতরাং বাড়ি থেকে, স্যারদের কাছ থেকে এক্সট্রা আদর পাই। আড্ডায় বসলে মানবেন্দ্রর মা, বুলুর মা চানা স্তা পাঠান। আমরা খাই, গল্প করি, যে যার মত খালি গলায় গান করি।

মানবেন্দ্রর গানের ধারণা ভাল। বনেদী চক্রবর্তী পরিবারের ছেলে। সে আমাদের মান্না দের কথা ব লে। মান্না দের বাংলাহি ন্দ গানের কথা বলে। অন্য শিল্পীদের তুলনায় মান্না দে অনেক উর্ধ্বে– এইসব বলে। গানের উদাহরণ দেয়।

মানবেন্দ্রর মুখেই প্রথম শুনলাম বাংলার চেয়েও হিন্দি গানের জগৎ তখন বেশি মাতাচ্ছেন মান্না দে। তালাত মাহমুদ, মহম্মদ রফি, মুকেশ, লতা মুঙ্গেশকর, শামসাদ বেগম, আশা ভোঁশলে, নূরজাহান, মহেন্দ্র কাপুর আরও পরে কিশোরকুমার এইসব শিল্পীর সঙ্গে পালস্না দিয়ে তিনি হিন্দি গানের জগৎ মাতাচ্ছেন।

বাঙালি শুরু থেকেই হিন্দি গান আর সিনেমার জগৎ জয় করেছিল। শচীন দেববর্মণ, অশোককুমার, কিশোরকুমার, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত, শর্মিলা ঠাকুর, জয়া ভাদুড়ি (পরে বচ্চন), রাখি, মিঠুন চক্রবর্তী, কুমার শানু এরকম প্রচুর উদাহরণ।

রাজ কাপুরের ক্যামেরাম্যান ছিলেন রাধু কর্মকার। আমাদের বিক্রমপুরের লোক। গ্রামের নাম উয়ারি। পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় বিক্রমপুরের যে স্কুলে আমি পড়তাম সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। রাজ কাপুর তাঁর আত্মজীবনীর একটি অংশ লিখেছিলেন ভারতের কোন এক পত্রিকায়। পত্রিকাটির নাম আজ আর মনে নেই। লেখাটা পড়েছিলাম গভীর আগ্রহ নিয়ে। সেই লেখায় তিনি রাধু কর্মকারের জন্মস্থান, স্কুল আর ছেলেবেলার কথা লিখেছিলেন। পড়ে শিহরিত হয়েছিলাম। আমাদের বিক্রমপুরের লোক রাধু কর্মকার! আমি যে স্কুলে পড়েছি সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি!

বাঙালি মান্না দেও হিন্দি গানের জগৎ জয় করলেন প্রথম। বাংলা জয় করার আগে।

কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা *আনন্দ পাবলিশার্স* প্রকাশ করেছে মান্না দের আত্মজীবনী। *জীবনের জলসাঘরে*। ফ্ল্যাপে লেখা হয়েছে 'একদিন উত্তর কোলকাতার সিমলেপাড়ায় দুষ্টুমি করে ঘুরে বেড়াত যে-কিশোর, কুস্তির আখড়ায় লড়াইয়ে নামত, সে কীভাবে যেন একসময় সংগীতকে আপন করে নিল। সুধাসাগরের তীরে এসে দাঁড়াল সে। সেই প্রথম যৌবনে সংগীতই হয়ে উঠল তার একমাত্র সাধনা, নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। আরও পরে তার ধ্যান জ্ঞান প্রেম ঈশ্বর। সেদিনের সেই কিশোর আজকের 'জাতীয় শিল্পী' মান্না দে।

বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ, বিশেষত প্রবাদপ্রতিম শিল্পী তথা তাঁর ছোটকাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের প্র ত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও আশীর্বাদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সুরসাধকদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও বেশি সময় মান্না দে তাঁর সংগীতসাধনা কে অব্যাহত রেখেছেন অপরিসীম নিষ্ঠায়। আজ তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর কথা, তাঁর গানের কথা বলে শেষ হওয়ার নয়।'

আরেকদিককার ফ্ল্যাপে লেখা হয়েছে 'মান্না দের জন্ম ১ মে ১৯১৯। শিক্ষা স্কটিশ চার্চ কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ। ১৯৩৭এ কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের কা ছে সংগীত শিক্ষার শুরু। গায়করূপে প্রথম মঞ্চে (কলেজ ফাংশনে) আত্মপ্রকাশ ওই বছরেই।

উদ্ভাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে তালিম ১৯৩৯ থেকে। কৃষ্ণচন্দ্রর সহকারী হয়ে প্রথম মুম্বাই যাত্রা '৪২এ। শা স্ত্রীয় সংগীতের তালিম উস্ত্মাদ আমন আলি খাঁসাহেবের কাছে।

প্রথম পেব্ যাক *তমান্না* ছবিতে–'জগো আঈ উষা'। শচীন দেববর্মণের সুরে *মশাল* (১৯৫০) ছবিতে 'উপর গগন বিশাল' গানটি গেয়ে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা।

প্রথম বাংলা ছবিতে পেব্ যাক *গৃহপ্রবেশ*এ (১৯৫৪)। *শঙ্খবেলা* ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে প্রথম পেব্ যাক 'কে প্রথম কাছে এসেছি'। নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত। একাধিকবার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের জাতীয় পুরস্কার, লতা মুঙ্গেশকর পুরস্কার, শ্যামল মিত্র অ্যাওয়ার্ড, আনন্দলোক পুরস্কার, আলাউদ্দিন খাঁ পুরস্কার, পদ্মশ্রী খেতাব ইত্যাদি। ২০০৪এ 'জাতীয় গায়ক'এর স ম্মান লাভ।

সহধর্মিণী সুলোচনা এবং দুই কন্যা সুরমা ও সুমিতা।'

যৌবনের শুরুতে মান্না দে হয়ে উঠলেন আমাদের প্রিয়সঙ্গী।

প্রতিদিন তাঁর গান শুনি, প্রতিদিন নতুন করে মুগ্ধ হই। প্রেমে পড়ার বয়স এসে গেছে। পাড়ার সুন্দরী মেয়েটিকে দেখলে বুকের ভেতর গুনগুনিয়ে ওঠেন মান্না দে। 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই, পাছে ভালোবেসে ফেল তাই দূরে দূরে রই'।

আমার টুনুমামাঅনুমামামিনুখালা মান্না দের মহা ভ ক্ত হয়ে উঠেছেন। টুনুমামা পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছেন, মিনুখালার বিয়ে হয়েছে বড়লোক পরিবারে, অনুমামা বিএ পড়েন। বেতন পেয়ে টুনুমামা কিনে আনেন মান্না দের রেকর্ড। হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে অনুমামা কিনে আনেন। মিনুখালা খবর রাখেন পাটুয়াটুলির রেকর্ডের দোকানে মান্না দের কোন্ নতুন রেকর্ড এল। তিনদিক থেকে রেকর্ড সংগ্রহ। আমার নানাও গানপাগল মানুষ। যৌবনে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। আমার মামাখালারা সবাই কম বেশি গান করেন, গান-পাগল। বীণাখালার রবীন্দ্রসংগীতের সিডি বেরিয়েছে। আমরা কাছাকাছি

বয়সের। নিজেরা দল বেঁধে ওই বাড়িতে গানের আসর করতাম।

বাড়িতে নতুন রেকর্ড আসা মানে দুপুরের পর থেকে শুরু হত গান শোনা। পুরনো গ্রামোফোনটা তো আছেই, তারপরও টুনুমামা তার বেতনের টাকা জমিয়ে তখনকার দিনে মাত্র বাজারে এসেছে এমন একটা সর্বাধুনিক গানের যন্ত্র 'চেঞ্জার' কিনে ফেললেন। একসঙ্গে ছয়টা রেকর্ড চাপানো যায়। শূন্যে ঝুলে থাকে রেকর্ডগুলো। একটা শেষ হলে তার ওপর নামে আরেকটা। ততদিনে লংপেয়িং এসে গেছে। একসঙ্গে ছয়টা লংপেয়িং চাপালে দুপুরের পর থেকে শেষ বিকেল, সন্ধ্যা পর্যন্ত রেকর্ড বদলাতে হয় না। গান চলতেই থাকে। অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে মান্না দের গান শুনি আমরা।

কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল
তুমি আর ডেক না, পিছু ডেক না, আমি চলে যাই
তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়
চাঁদের আশায় নিভায়ে ছিলাম যে দীপ আপন হাতে
এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি
এ জীবনে যত ব্যথা পেয়েছি
আমি সাগরের বেলা, তুমি দুরন্ত ঢেউ, বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও
আমি নিরালায় বসে বেঁধেছি আমার জীবন বীণ
চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে
সেই তো আবার কাছে এলে
আবার হবে তো দেখা
এই তো সেদিন তুমি আমারে শুধালে
দরদী গো কী চেয়েছি আর কী বা পেলাম
আমি তার ঠিকানা রাখিনি, ছবিও আঁকিনি
কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায়, কী কথা রইল বাকি।

(এই গানটি লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর সুধীন দাসগুপ্ত। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম *কথায় কথায় রাত হয়ে যায়*।)

কত আর উদাহরণ দেব! এরকম দেড়দু 'শো গানের কথা বলতে পারব আমি। মান্না দের বেশিরভাগ গানই জনপ্রিয়। শুধু জনপ্রিয় বললে ভুল হবে, তুমুল জনপ্রিয়, অতুলনীয় জনপ্রিয়। অজস্র আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন তিনি, বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য গেয়েছেন, হিন্দি চলচ্চিত্রের জন্য গেয়েছেন হাজারখানেক গান। বহু চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক তিনি, বহু গানের সুর করেছেন। মুক্তি পায়নি এমন অনেক চলচ্চিত্রে রয়ে গেছে তাঁর গান। বাংলা নাটকে গান গেয়েছেন। গীতগজলভজন গেয়েছেন, রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, মারাঠী চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন, হিন্দি সিরিয়ালে গান গেয়েছেন, হিন্দি আধুনিক গান পরিচালনা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলসংগীত, শ্যামাসংগীত, গীতিনাট্যের গান, ছোটদের গান– কোথায় নেই মান্না দে। সংগীতের এক বিশাল মহাদেশ তিনি। তাঁকে নিয়ে লিখে শেষ করা যাবে না।

অনুমামা রেকর্ড কিনে আনলেন 'রাধা চলেছে মুখটি ফিরায়ে কাঁদে শ্যামের বাঁশরী'। যখনই ওই বাড়িতে যাই, বীণাখালাকে বলি, ওই গানটা বাজা। বীণাখালা আমার বন্ধু। খালার চেয়ে বন্ধু হিসেবেই বেশি প্রিয়। আমার সব কথা রাখে সে। রেকর্ড চাপায়। মান্না দে তাঁর জাদুকরী কণ্ঠে গান করেন, আমরা শুনতে থাকি। দিনের মত দিন কেটে যায়।

মান্না দে আসলে এক আকাশের নাম। আকাশ কখনো পুরনো হয় না, আকাশ প্রতিদিন নতুন। মান্না দের গা নে বাঙালি জাতির সোনালি বিকেলগুলো চিরকাল ভরে থাকবে, স্নিগ্ধ হয়ে থাকবে। এরকম শিল্পী কখনো পুরনো হন না।

ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদক, কথাশিল্পী

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ নভেম্বর

০২ নভেম্বর ১৯৩৫ ❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ নভেম্বর ১৯৬৫ ❖ বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের জন্ম
০৩ নভেম্বর ১৯৩৩ ❖ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম
০৪ নভেম্বর ১৯২৫ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
০৫ নভেম্বর ১৮৭০ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৮৪৮ ❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৯৫৪ ❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
১১ নভেম্বর ১৮৮৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
১১ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
১২ নভেম্বর ১৮৯৬ ❖ পক্ষীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ ❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম ॥ শিশু দিবস ॥
১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯১৭ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
২০ নভেম্বর ১৭৫০ ❖ টিপু সুলতানের জন্ম
২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ ❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

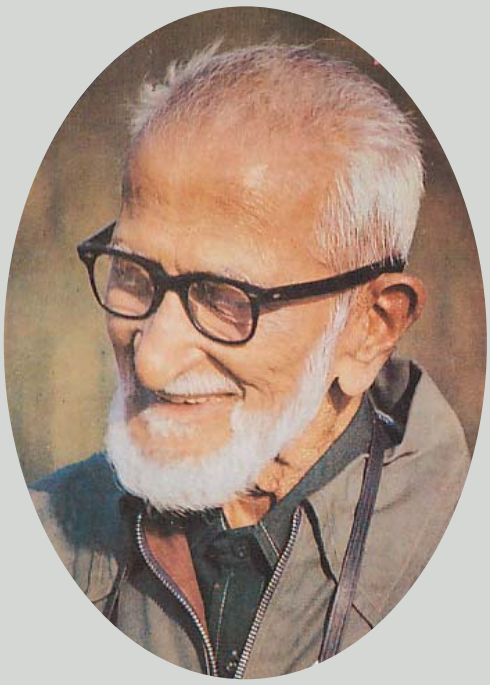

পক্ষীবিদ সেলিম আলী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মান্না দে: অমৃত সন্ধানে

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

'সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী।' হ্যাঁ, বিদায়ব্যথা এভাবেই বেজে উঠেছিল ২৪ অক্টোবর ২০১৩ উপমহাদেশের বিশ্রুতকীর্তি ও যুগন্ধর সঙ্গীতশিল্পী মান্না দের জীবনাবসানে। ৯৪ বছরে তাঁর এই প্রয়াণ। বাংলা সঙ্গীতজগতের স্বর্ণযুগের অবিসংবাদী অন্যতম পুরোধাপুরুষের মৃত্যু হল, যিনি বিগত সাতটি দশক জুড়ে অগণিত সঙ্গীতপ্রেমীকে তাঁর সঙ্গীতসুধায় স্নান করিয়ে গেছেন।

শিল্পীর কোনদিন মৃত্যু হয় না। সুরসাধক বোধকরি আরো গহনভাবে বেঁচে থাকেন ভক্তের অন্তরে, কেন না দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার বাইরেও সঙ্গীতের রয়েছে চতুর্থ আর এক মাত্রা। বৈজু বাওরা, তানসেন, লালন, রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তাই আমাদের স্মৃতিকোষে সতত জাগরূক, তেমনি মহম্মদ রফি, গীতা দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে।

অসংখ্য গান রেকর্ড করেছেন তিনি, সংখ্যায় প্রায় চার হাজার। নিজে সুর দিয়েছেন নিজের গানে, অপরের গানে। বাংলা এবং হিন্দিই কেবল নয়, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, মালয়ালম, তেলেগুসহ বহু ভাষাতেই গান করেছেন তিনি। ভারতের হেন সুরকার নেই, শচীন দেববর্মণ থেকে শংকরজয়কিশন, সলিল চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্তপ্যারেলাল, তিমিরবরণ, ভি বালসারা, নৌশাদ, রবিশঙ্কর, মহম্মদ রফি, কিশোরকুমার, বসন্ত দেশাই, স্বপনজগ মোহন, কল্যাণজীআন ন্দজী, রাহুল দেববর্মণরা যদি হিন্দি ছায়াছবির জগতে তাঁর গানের সুরকার হন, বাংলায় তাঁর গানে সুর দিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত, রতু মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সুপর্ণকান্তি ঘোষ, কমল দাশগুপ্ত, নীতা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর কাকা স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র দে, যিনি মান্না দের স ঙ্গীত শিক্ষার

> একেবারে গোড়ায় কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের নজরে না পড়লে তাঁর কাছে তালিম নেওয়া হত না মান্নার এবং এই শিক্ষানবিশির সূত্র ধরেই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রথমে কলকাতায় সিনেমা স্টুডিওতে নিয়ে যান এবং পরে সঙ্গীত পরিচালকরূপে কৃষ্ণচন্দ্র মুম্বই গেলে তাঁর ভাইপোটিকেও নিয়ে যান, এবং ১৯৪৩এই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সঙ্গীত পরিচালিত ছবি *তমান্নায়* মান্না দে কে প্লেব্যাক গাইবার সুযোগ করে দেন।

আদিগুরু।

তাঁর গানে তিনি নিজেও সুর দিয়েছেন প্রচুর। আর অন্য শিল্পীর গানে তাঁর সুরারোপ তো অগুনতি। সঙ্গীতজগতে তাঁর আবির্ভাব কিন্তু গায়ক হিসাবে নয়, সুরকার হিসেবে। ১৯৪৯এ মান্না দে যখন মাত্রই ২৩ বছরের, শৈলেন রায় রচিত গান 'বালুকাবেলায় অলস খেলায় যায় বেলা' গানটিতে সুর দিলেন তিনি, গাইলেন সুপ্রীতি ঘোষ। এর পরপরই ১৯৪৯এ কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মুম্বই যান তিনি এবং পরের বছর ১৯৪৩এ তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড বেরোয় সহশিল্পী সুরাইয়ার সঙ্গে, *তমান্না* ছবির জন্য গাওয়া গান। এটাও উল্লেখযোগ্য, তাঁর বাংলা গানের রেকর্ড বেরোয় হিন্দি গানের রেকর্ড বেরোনর বহু পরে, ১৯৫৩তে।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব হল মান্না দের মত সঙ্গীতপ্রতিভার আবির্ভাব, বিকাশ ও খ্যাতির চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছনো? এর কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় সঙ্গীতচর্চার ধারা, সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত সে সময়কার চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, বাঙালি মধ্যবিত্তজীবনে ধীর লয়ে সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ও চর্চা, শিল্পের অন্যান্য শাখা যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য, নাটক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গীতেরও সহযোগী হয়ে ওঠার অনুক্রমণিকা, পরাধীন ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি আর সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়কে। সঙ্গীত পরম্পরানির্ভর। উনিশ শতকের সূচনাবিন্দু থেকেই যদি আমরা শহুরে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার দিকগুলো থেকে কীভাবে একদিকে ধ্রুপদীসঙ্গীত, অন্যদিকে থিয়েটার ও যাত্রার গান, পাশাপাশি রামমোহনবাহিত সঙ্গীতের ধারা কীভাবে নিধুবাবু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, এন্টনি কবিয়াল, গিরিশ ঘোষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তে পরিশীলিত হয়ে উঠল, কালের দাবিতে তার পাশাপাশি বিজয় সরকার, নিবারণ পণ্ডিতরা একদিকে, অন্যদিকে গণসঙ্গীতের উৎসমুখ খুলে দিল, পরিশেষে সব গান গতিজাড্য পেল, আমরা যাকে আজকের দিনে 'আধুনিক গান' অভিধা দিই, সেখানে এসে এবং তৎসহ আজকের দিনে দুরন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের জন্য ব্যবহৃত গানে, এসব পরম্পরার মধ্যেই মান্না দের অব স্থান সুনির্দিষ্ট করতে পারব আমরা। অতঃপর সেই দিকেই প্রয়াসী হওয়া যাক।

দুই.

সঙ্গীত প্রতিভা হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মান্না দের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল চারের দশকের বাংলা ও মুম্বইয়ের (তখনকার বোম্বাই) চলচ্চিত্রশিল্পের ক্রমপ্রসারমানতা। এক্ষেত্রে তাঁর কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের ভূমিকা ছিল সর্বাতিশায়ী। মান্না দের স ঙ্গীতগুরুরা ছিলেন দবীর খাঁ, ওস্তাদ আমন আলী খাঁ এবং পরবর্তীকালে ওস্তাদ আবদুল রহমান। কিন্তু একেবারে গোড়ায় কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের নজরে না পড়লে তাঁর কাছে তালিম নেওয়া হত না মান্নার এবং এই শিক্ষানবিশির সূত্র ধরেই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রথমে কলকাতায় সিনেমা স্টুডিওতে নিয়ে যান এবং পরে সঙ্গীত পরিচালকরূপে মুম্বই গেলে ভাইপোটিকেও সঙ্গে নিয়ে যান, এবং ১৯৪৩এই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সঙ্গীত পরিচালিত ছবি *তমান্নায়* মান্না দে কে পেস্নব্যাক গাইবার সুযোগ করে দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অভিনেত্মগায়ক। চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠ যখন আসেনি, স্লেসময় গাইয়ে অভিনেত্মঅভি নেত্রীদের জনপ্রিয়তা ছিল তুমুল। ১৯৩৯এ এ দেশে ছবিতে কথা আসার আগে পর্যন্ত্ম চলচ্চিত্রের যে গতানুগতিকতা, ছবিতে শব্দ সংযোজিত হওয়ায় সহসা স্থিতিজাড্য ঘুচে গিয়ে চলচ্চিত্রে প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যায়। আর প্রথমবার যখন প্লেব্যাক পদ্ধতি প্রচলিত হল বাংলা ছবিতে *ভাগ্যচক্র* ছবিটির মাধ্যমে, প্লেব্যাক শিল্পীদের জয়যাত্রার সূচনালগ্ন নির্মিত হয়ে যায় তখন থেকেই। নীতিন বসু পরিচালিত *ভাগ্যচক্র* তাই কেবল ছায়াছবিরূপেই দিশারী ভূমিকা পালন করেছে তাই নয়, শব্দ যুক্ত হয়ে ছবিতে সঙ্গীতের ঋণসম্ভাবনাও উন্মুক্ত হওয়ার সূচনাবিন্দু তৈরি হল এবার থেকে। ছায়াছবিতে সঙ্গীতজ্ঞদের এই রমরমার জন্যই কুন্দনলাল সায়গল, যমুনা দেবী, কানন দেবী, পঙ্কজকুমার মল্লিকদের অড়্গায় প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল। মান্না দের কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দেও অস ম্ভব জনপ্রিয় হন গোড়ার দিকে নাটকে, পরে সিনেমায় অভিনেত্মগায় কের দ্বৈত ভূমিকায়, দেবকী কুমার বসুর *চণ্ডীদাস* ছবিতে প্রথম আবির্ভাব তাঁর, আর সুদামার ভূমিকায় তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত গান 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে' তাঁকে মুহূর্তে খ্যাতিমান করে তুলল। এ ছবিতে অভিনয় করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উমাশশীও। এই ত্রিমূর্তি নিউ থিয়েটার্সে বহুকাল একত্রে অভিনয় করে গেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরেই মান্না দের কি শোর বয়স থেকেই স্টুডিওপাড়ায় আস্মাযাওয়া।

বিশ শতকের তিন, চার ও পাঁচের দশক এই উপমহাদেশে সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক যে পটভূমি তৈরি করছিল এবং বিশেষভাবে চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতকে যে গতিজাড্য দিয়েছিল, মান্না দে তার সফল ফসল। তাই এর পশ্চাৎপট বিশদ জেনে নেওয়া জরম্নরি। পারিবারিক প্রভাব (কৃষ্ণচন্দ্র দে ছাড়াও মান্না দের মেজকাকা হেমচন্দ্রের সঙ্গেও সঙ্গীতের যোগ ছিল। তাঁর শখের অর্কেস্ট্রা পার্টি ছিল, যেখানে তিনি ক্লারিওনেট বাজাতেন। মান্না দের বড়ভাই প্রণবচন্দ্রও প্রথম জীবনে নিউ থিয়েটার্সে সঙ্গীত পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন, *কঙ্কাল, প্রিয় বান্ধবী, সুধার প্রেম* ছবিতে সুর দিয়েছিলেন। তাঁর ছোটভাই প্রভাসচন্দ্র, ডাকনাম ভেলু, কৃষ্ণচন্দ্রের কাছেই গান শিখে, পরবর্তীকালে সুবিনয় রায়ের কাছে, এতটাই গুণী সঙ্গীতশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন যে মান্না দে তাঁর সুরে একাধিক গান করেন। প্রভাসচন্দ্রের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় মান্না দের একাধিক বিখ্যাত গান রয়েছে। যেমন 'আমায় আকাশ বলল', 'ও চাঁদ সামলে রাখ', 'প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন' বা 'দীপ ছিল, শিখা ছিল'। মান্না দের পরিবা রের সঙ্গীতপ্রীতি তাঁদের একমাত্র বোন বীণাপাণির ওপরেও বর্তেছিল, তবে বিয়ের পরে তিনি আর সঙ্গীতচর্চাকে ধরে রাখতে পারেননি। বোঝা যাচ্ছে, মান্না দে সঙ্গীতজগতে তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যবিরোধী বা সহস্মাগ ন্তুক নন। তবে একথা ঠিক, মাত্র তেরো বছর বয়সে মান্না দের ছোটকাকা, তাঁর সঙ্গীতগুরু 'বাবুকাকা' যদি অন্ধ হয়ে না যেতেন, মধ্যবিত্ত অন্যান্য বাঙালির মত কৃষ্ণচন্দ্রও হয়তো স্কুলক লেজে পড়াশুনো শেষে চাকরিবাকরি নিয়েই থাকতেন। দৈবাৎ চোখ হারান বলে সঙ্গীতের সুপ্ত প্রতিভাকে অবলম্বন করার দ্বিতীয়রহিত পথ বেছে নিতে হয়েছিল তাঁকে। অন্ধত্ব কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে আকস্মিক অভিঘাত; সঙ্গীতপ্রতিভা না থাকলে যে কেউই সুরদাস হতে পারেন না।) যেমন সক্রিয় কারণ, তেমনি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর যাবতীয় কলাশিল্পের বিকাশ ও বিনাশ নির্ভর করে। মান্না দের স ঙ্গীতজীবনে যেহেতু বাংলা এবং আরো বেশি করে মুম্বই চলচ্চিত্রশিল্প অঙ্গাঙ্গি যুক্ত এবং সিনেমাজগতে কোটি কোটি

টাকা লগ্নী করতে হয়, সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিকে বিহঙ্গাবলোকন জরুরি। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, তিরিশের বিশ্বব্যাপী মন্দা যখন, সে সময়কালে কেবল ১৯৩৫এই সারা ভারতে তৈরি হয়েছিল ২৩৩টি চলচ্চিত্র। এত যে ছবি, সেখানকার টাকার জোগান কী করে আসত? বাংলা থেকে অভিনেত্রীঅভি নেত্রী, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক্গায়িকা পাড়ি জমাচ্ছেন বম্বেতে, সারা ভারত থেকেই, কোন্ অর্থনৈতিক বরাভয় কাজ করেছে এর পেছনে না জানলে মান্না দ্বের উ দ্ভব, বিকাশ ও জনপ্রিয়তার পেছনে যে বৃহৎ পুঁজির সহায়তা ছিল, যে সহায়তা ছাড়া তাঁর মত প্রতিভাবানেরও এতটা বিকশিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তা উপলব্ধ হবে যে, তা হলে অর্থনীতির উৎস সন্ধানে একটু যাই।

তিরিশের দশক বিশ্বব্যাপী মন্দার দশক। এরমধ্যেই ১৯৩৯৪৫ ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারতবর্ষের মত ঔপনিবেশিক ও তৃতীয় বিশ্বের দেশকে পলাশীযুদ্ধ পরবর্তী সময় ধরে অর্থনৈতিকভাবে লাগাতার শোষণ করে চলেছে ব্রিটিশ প্রভুরা 'Whitemen's burden' নাম দিয়ে, সম্পদের বহির্গমন চলছে অহরহ। এরই পাশাপাশি চলছে স্বাধীনতার জন্য লড়াই। বিগত শতকের তিরিশ থেকে পঞ্চাশের সময়কাল আমাদের আপাতত বিবেচ্য, কেন্নো মান্না দ্বের গায়ক হ য়ে গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্ব সূচিত হয়েছিল, বা বলা চলে একটি সার্থকতায় এসে পৌঁছেছিল ১৯৫৩ সাল নাগাদ, বম্বেতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যখন তিনি তাঁর স্বভূমি বাংলায় পা রাখলেন, শুরু করলেন নিয়মিত চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক গাইতে, আর পাশাপাশি তাঁর আধুনিক গানের রেকর্ডও বেরোতে শুরু করল ঐ একই সময়ে, যাকে পরিভাষায় 'বেসিক ডিস্ক'এর গান ব লে। উল্লেখ্য, প্রথম যে চলচ্চিত্রে তাঁকে নেপথ্য শিল্পীরূপে পাই তার নাম *অমরভূপালী* (এটি বাংলামারাঠী দ্বিভাষিক ছবি। গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁর বেসিক ডিস্কের প্রথম গান 'কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল' গানের গীতিকারও সেই গৌরীপ্রসন্ন।

অর্থনৈতিক মন্দা যেমন, তেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছু আগে ব্রিটিশ ভারতে বিশ্বেশ্বরাইয়া দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়েই ভারতের অথনৈতিক বিকাশ সম্ভব। প্রথম যুদ্ধোত্তরকাল থেকেই এদেশে গুজরাটি, পার্শি ও মাড়োয়ারী উদ্যোক্তাদের হাত ধরে পশ্চিম ভারতে বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত, কাগজ, চিনি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠার প্রবণতাকে লক্ষ্য করেই বিশ্বেশ্বরাইয়ার এই সিদ্ধান্ত, এর পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র বসু ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যে রূপরেখা তৈরি করেন, সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি শিল্প বিকাশের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় করেছিলেন, তারই যেন সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৪ সালে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে মুম্বইয়ের আটজন শিল্পপতির 'বোম্বাই পরিকল্পনা'র মধ্যে। পনের বছরের মধ্যে দেশের জাতীয় আয় তিনগুণ বৃদ্ধি করার ও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ বাড়ানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসী এই পরিকল্পনাকারীরা স্বভাবতই ভারী ও মাঝারি আকারের শিল্প গড়বার স্বপ্নই দেখেননি কেবল, অনেকটাই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। অন্যদিকে শিল্প স্থাপনাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বিত করলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ১৯৩৮ থেকেই যিনি সুভাষচন্দ্র নেহরুর 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' (National Planning Commission)র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আগ্রহাতিশয্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিকল্পনা কমিশন (১৯৫০) এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫২)। ১৯৪৮এ সদ্য স্বাধীন ভারতের যে শিল্পনীতি প্রণীত হয়েছিল, তার বৈশিষ্ট্য ছিল মিশ্র অর্থনীতি, আর সেই অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি উদ্যোগকে উদার আহ্বান জানানো হয়। লৌহ ইস্পাত, কয়লা শিল্প, তেল, জাহাজ ও বিমানযান নির্মাণ করাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই উপমহাদেশ সরাসরি জড়িত না থাকলেও এখানে যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। মিত্র শক্তির খাদ্য সংস্থানের প্রতি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা এ দেশে, বিশেষত বাংলায় ডেকে এনেছিল দুর্ভিক্ষ, ইতিহাসে যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত, পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষে, পাশাপাশি এই যুদ্ধই দেশের নানা প্রান্তে পুঁজির বিকশিত বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল কন্ট্রাকটরি, কালোবাজারির মাধ্যমে। সে সময়ের ওপর ভিত্তি করে লেখা গল্প কবিতা উপন্যাসে এসবের হদিশ মিলবে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক *নবান্ন*, কৃষণ চন্দরের উপন্যাস *অন্নদাতা* বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের এহেন পঙক্তি, 'তুমি তো মানুষ গোনো, তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি' স্মর্তব্য। এই সহসা উদ্বৃত্ত পুঁজি নিয়োজিত হল অনেকটাই চলচ্চিত্র শিল্পে, কেন্নো দ্রুত মুনাফা উপার্জনের এমন মাধ্যম খুব বেশি নেই। ফলে একের পর এক গড়ে উঠতে লাগল স্টুডিও, সিনেমা হল। অভিনেত্রীঅভি নেত্রীরা পরিণত হতে শুরু করলেন গ্ল্যামারবিভূষিত তারকায়। তিরি শের দশকে ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছে চলচ্চিত্রাভিনয় ছিল মারাত্মক ট্যাবু, একমাত্র নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা নিয়তিতাড়িত হয়ে এ পেশায় আসত, আর নয়তো নিষিদ্ধ পল্লী থেকে। চল্লিশের পর থেকে চেহারাটা পালটাতে শুরু করে। এর পেছনে অর্থের ভূমিকা কম নয়। নিউ থিয়েটার্স বা ম্যাডান কোম্পানি ধরে রাখতে পারছিল না সিনেমার

অসংখ্য দিকের সঙ্গে যুক্ত কুশীলবদের, তা সে অভিনয় ক্ষেত্রেই হোক অথবা পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, সঙ্গীত পরিচালনা, সম্পাদনা বা প্লেব্যাক গান করা। ঋত্বিক ঘটক আর শরদিন্দু বম্বে গেলেন চিত্রনাট্য লিখতে, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রাথমিকভাবে সম্পাদনার কাজে, কানন দেবী কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ অভিনয় ও গানের জন্য। গানে তো পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, গীতা দত্ত প্রমুখের মেধা তালিকা খুবই উত্তুঙ্গমানের ও দীর্ঘ। সঙ্গীত পরিচালকদেরও সর্বভারতীয় জোয়ার এল এসময়, যেখানে বাঙালিদের মধ্যে সলিল চৌধুরী, শচীন দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কলকাতার প্রতি কোন রকম উপেক্ষা প্রদর্শন করে নয়, কলকাতাকে গুরুত্ব দিয়েই বম্বেতে যাওয়া, গান করার পেছনে কৃষ্ণচন্দ্র ও মান্নার মূল এষণা ছিল সর্বভারতীয় পরিচয় পাওয়া।

মান্না দে যে সময়ে গানের জগতে আসেন, তখন বাংলা গানের ঐতিহ্যময় মহিমান্বিত প্রবাহ আবর্তিত হচ্ছে নানান ধারায়। রবীন্দ্রনাথসহ পঞ্চকবির গানে ভেসে যাচ্ছে বাংলা। কাজী নজরুল একদিকে বেতার, অন্যদিকে নাটক, চলচ্চিত্র আর একদিকে এইচএমভি'র সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে সর্বাতিশায়ী প্রভাব ছড়াচ্ছেন। ১৯০০ থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের আবির্ভাবের ফলে অসংখ্য গায়ক বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভার নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন। আঙ্গুরবালা ইন্দুবালা কানন দেবী রাধিকা গোস্বামী ভীষ্মদেব পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীতজগতের মধ্যগগনে। এঁদের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সামান্য একটি কথাই বলা যাক। পঙ্কজকুমার মল্লিকের রেকর্ড বিজ্ঞাপন হত এভাবে, 'Is your favourite Pankaj Mullick

or Bing Crossby?' তার সঙ্গে দু'জনের ছবিও থাকত বিজ্ঞাপনটিতে। বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ক্রসবির সঙ্গে তুলিত হতেন পঙ্কজকুমার।

ধ্রুপদী সঙ্গীতচর্চা চলছিল এর পাশাপাশি, যদিও তা খুবই সীমিত সঙ্গীতরসিকদের জন্য। কলকাতার বাইরে নগর সভ্যতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যে চিরায়ত বাংলা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলা, সেখানে তো হাজার বছর ধরে গানের অনাবিল, অফুরন্ত প্রবাহ। ভাটিয়ালি ভাদু টুসু মাইজভাণ্ডারি আলকাপ ভাওয়াইয়া গম্ভীরা থেকে নবান্নের গান, বিয়ের গান, জারি সারি মারফতি মর্শিয়া, সবার ওপরে বাউল ও কীর্তন। শহুরে সভ্যতার উপচার, উৎপাত ও বিকৃতিরূপে খেমটা, খেউড়, কবিগান, হাফ আখড়াইও এক ধরনের শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য ছিল। পরাধীন ভারতে ছিল দেশাত্মবোধক গানের অবিরল প্রবাহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে মুকুন্দদাস হয়ে অসংখ্য লোকশিল্পীর লেখায় ও কণ্ঠদানে মুখরিত। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের কেউ কেউ গীতিকার হবার স্বপ্নে সার্থক গান লিখেছেন বেশ কিছু, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নিশিকান্ত, তিরিশের মধ্যপর্ব থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হল গণনাট্যের গান। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রমুখ এক্ষেত্রে পুরোধা।

এই ব্যাপ্ত ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে উঠে আসতে হয়েছে মান্না দে-কে। সঙ্গীতত্ত্বাত্ত্বিকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় (ইনি সুরকার সঙ্গীতকার এবং গায়ক, এই তিনও ছিলেন), ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে তর্ক চালাচ্ছেন, সুদূর মাইহারে বসে নিজে বিভা ছড়াচ্ছেন ও যুগপৎ ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীতে মহীরুহ নির্মাণে তৎপর বাবা আলাউদ্দীন খাঁ আর লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের কাছে নাড়া বাঁধছেন ভাবীকালের গায়ক্কঅভি নেতা পাহাড়ী সান্যাল, এমনই ঋণপ্রসূ সময় সেটা।

মান্না দে বিকশিত হয়েছিলেন এসবের মধ্যে দিয়ে। এর পেছনে কার্যকর ছিল একদিকে সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহ, অন্যদিকে নিজেকে সঙ্গীত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার গভীর সাধনা। বাড়িতে কৃষ্ণচন্দ্রের দৌলতে স্লেয়ু গের সেরা শিল্পীরা আসতেন, গান গাইতেন। কারা ছিলেন সেই শিল্পী তালিকায়? ছিলেন ওস্তাদ বাদল খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বেগম আখতার। শচীন দেববর্মণ তো গান শিখতেই আসতেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। এতসব গুণী ও স্বনামধন্যদের গান শোনা অসামান্য প্রাপ্তি ছিল মান্না দ্বের কা ছে, যে প্রাপ্তিতে নিজেকে তিনি ঋদ্ধ করতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে তো তালিম নিতেনই, এছাড়া দবীর খাঁ, ওস্তাদ আমন আলী খাঁ, আবদুল রহমান খাঁ প্রমুখের কাছে সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তিনি।

সঙ্গীত ও তৎসহ ব্যায়াম। রীতিমত কুস্তি শিখেছেন তিনি তখনকার বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গোহুর (প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচরণ) কাছে। সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা, এই যুগলবন্দী মান্না দ্বে কে সাহায্য করেছিল, অনেকক্ষণ ধরে দম ধরে রাখবার দক্ষতা অর্জন করেন তিনি এর ফলে। তাই তাঁর গান অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে, কী প্রলম্বিত করতে পারতেন তিনি লয়কারিকে।

কলকাতায় তখন চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে ওঠার মুখে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছবিতে গানের ব্যবহার। ফলে চলচ্চিত্রশিল্পের গোড়া থেকেই সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল চলচ্চিত্রশিল্প। শহরে একের পর এক স্টুডিও তৈরি হচ্ছে। প্রথমে ম্যাডাম, তারপর একে একে অরোরা সিনেমা কোম্পানি, ইঙ্গো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। বীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩১এ যখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও তৈরি করেন, তাঁর সে বৈভবের কাছে অন্য স্টুডিওগুলো ম্লান হয়ে পড়ে। কলকাতায় নির্মিত হলেও নিউ থিয়েটার্স সর্বভারতীয়ত্বের প্রতিনিধিত্ব করত, যেহেতু এখান থেকে কেবল বাংলা নয়, তৈরি হত হিন্দি, এমন কি দক্ষিণ ভারতীয় দর্শকদের জন্য তামিল ছবিও। তিমিরবরণ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ প্রমুখের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেইসূত্রে প্রথম যৌবন থেকেই কাকার ছায়াসঙ্গী হয়ে মান্না দে এখানে আসতেন এবং রথীমহারথী গায়ক্ক গায়িকাদের সঙ্গে মোলাকাত ও তাঁদের গান শোনা, গানের তালিম দেখার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। এসম য়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন গান শুনিয়ে বন্ধুদের মাত করে দিতেন এতটাই যে স্লেসম য়ে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারকলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে বন্ধুরাই মান্নাকে যোগ দিতে তাঁর কাকার কাছে দরবার করে, কেন না কাকা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর বিরোধী সঙ্গীত্তেনাদান ভাই পোকে তখুনি প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়াতে। গুরুর আদেশ ছাড়া সঙ্গীত পরিবেশনের অধিকার ছিল না শিষ্যের, এমনই নিয়ম ছিল সেকালে। সেজন্যই ওস্তাদ আলাউদ্দীনের কাছে সেতার শিখেও গুরুর আদেশ পাননি বলে কোনদিন শ্রোতার সামনে বাজাননি, এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক।

মান্না দ্বের কি ন্তু প্রতিযোগিতায় গাইতে গুরম্ন কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি শেষপর্যন্ত মিলেছিল, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল আরকুহার্ট স্বয়ং চিঠি লিখলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে, যেন তিনি মান্নাকে গাইবার, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার অনুমতি দেন, কেন না তাঁর যুক্তি ছিল, এই প্রতিযোগিতা তো নবীন প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যেই। রাজি হয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, দু'মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে শিষ্যকে এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন যে প্রতিযোগিতার প্রায় প্রতিটি বিভাগে– ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ভজন, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, টপ্পা ও গজলে প্রথম হলেন, তবু আক্ষেপ, ঠুংরি আর আধুনিক গানে সেকেন্ড হয়েছিলেন বলে। একবার নয়, পর পর তিনবার প্রতিযোগিতায় এমন কৃতিত্ব তাঁর, যেজন্য রুপোর তানপুরা পান পুরস্কারস্বরূপ। একই সময়ে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনেও যোগদান করে সব বিভাগে প্রথম হন। যোগ্য গুরম্নর যোগ্য শিষ্যরূপে মান্না দে গড়ে উঠছিলেন এভাবেই।

সঙ্গীতশিল্পী হবেন, গোড়ায় নিজের সম্পর্কে কিন্তু এরকম অভীপ্সা ছিল না পূর্ণচন্দ্র এবং মহামায়ার চার ছেলে ও এক মেয়ের অন্যতম প্রবোধের চিন্তায়। প্রবোধচন্দ্র ছিল মান্নার পোশাকি নাম। উত্তর কলকাতার সিমলায় জন্ম, যেখানে জন্মেছিলেন আর এক যুগন্ধর পুরুষ, স্বামী বিবেকানন্দ। সমাপতন হয়তো, স্বামীজিও কুস্তি শিখেছিলেন, মান্না দ্বে ও। আর চব্বিশ বছর বয়সে মান্না প্রথম নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন হিন্দি ছবি *তমান্নায়* প্লেব্যাক করে সুরাইয়ার সঙ্গে দ্বৈতসঙ্গীতে। স্বামীজির ওই চব্বিশ বছর বয়সে *সঙ্গীত কল্পতরু* নামে অসামান্য সঙ্গীতগ্রন্থের সম্পাদনা, নিজের সুদীর্ঘ ভূমিকাসমেত। মান্না দে জন্মসূত্রে ভোগ করেছিলেন সিমলা ও সন্নিহিত জোড়াসাঁকোর উত্তাপ, এও কম সৌভাগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে তো কৃষ্ণচন্দ্র ও মান্না দে শিরোধার্য করে রেখেছিলেন বরাবর। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আঁধার রাতে একলা পাগোল যায় কেঁদে' গানটি কৃষ্ণচন্দ্রকে উপলক্ষ করেই নাকি লিখেছিলেন। গানটি কৃষ্ণচন্দ্র রেকর্ডও করেন।

পরিবারের ইচ্ছে ছিল, মান্না দে ওকালতি করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করে বেড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা, চলছিল এসব। এসময় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকে দেখে তাঁর

আঠারো বছরের ভয়ঙ্কর বয়স প্রলুব্ধ হয়েছিল দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কলকাতার বোমাতঙ্ক পরোক্ষ ভূমিকা রচনা করল মান্না দ্বের ভবিতব্যের।

ইতিহাস কেমন চালিকাশক্তি হয়ে কাজ করেছে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশে, দেখা যাক। কলকাতার চলচ্চিত্রজগতে সাময়িক অন্ধকার নেমে আসে যুদ্ধকালীন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে। শহরময় ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের দাপাদাপি, জাপানের বোমাবর্ষণ, এসবে আতঙ্কিত কলকাতার মানুষ শহর ছাড়ছে তখন। স্বভাবতই শিল্পীরাও হয় কর্মহীন, নয়তো শহরছাড়া। ঠিক এমন সময় বম্বের সিরকো প্রোডাকশন আহ্বান জানাল কলকাতার নামী কলাকুশলীদের। অভিনেত্রীরা তো বটেই, সিকরো সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল চিত্র পরিচালক, গায়ক, যন্ত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীকে। কলকাতা থেকে তাই বম্বেতে পাড়ি জমালেন পাহাড়ী সান্ন্যাল, ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা (পরবর্তীকালে চিত্র পরিচালনায় আসেন), সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক ফণী মজুমদার। তৎসহ কৃষ্ণচন্দ্র এবং মান্না। ১৯৪২ থেকে সুদীর্ঘ ষাট বছর, অর্থাৎ ২০০২ পর্যন্ত একটানা বম্বের সিনেমাজগতে তিনি নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পীরূপে স্বমহিম হয়ে ছিলেন। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

একদিকে বাণিজ্যনগরী বম্বে (অধুনা মুম্বই), অন্যদিকে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা, মান্না দ্বের সঙ্গীতপ্রতিভা বিকশিত ও আবর্তিত হয় দু'জায়গাতেই। ১৯৪২এ তিনি ব ম্বে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রের ছত্রছায়ায়, পরে স্বকীয়ভাবে গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালকরূপে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অজস্র হিন্দি ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, কখনো তিনি অভিনেতার লিপে গান গাইতেন না। কলকাতা বা বম্বের প্লেসব ছবি তে তিনি অভিনয় করতেন, অভিনেতা হিসেবে স্বকণ্ঠে গাইতেন। আর মান্না দে যেহেতু অভিনয় করতেন না, সে জন্য অভিনেতার গান করতেন প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে। শচীন দেববর্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র অন্যতম সঙ্গীতগুরু যাঁর, অন্যদিকে মান্না দ্বের অন ্যতম সঙ্গীতগুরু যিনি, তাঁর ছিল মধ্যবর্তী অবস্থান। তিনি অভিনয়ও করতেন না, আর তাঁর গান ছায়াছবিতে অভিনেতার লিপ মিলিয়ে গাইবার অনুমতিও তিনি দিতেন না। তাঁর গান সিনেমায় ব্যবহৃত হত অভিনেতাকে মূক রেখে।

'৪৩ থেকে '৫০, হিন্দি ছবিতে অনেকের কথায় ও সুরে ছায়াছবিতে কণ্ঠদান করা হয়ে গিয়েছে তাঁর, শচীন দেববর্মণের সঙ্গে সঙ্গীতের সহপরিচালকরূপে কাজ করতে গিয়ে মহম্মদ রফি প্রমুখ নামী গাইয়েদের গান শেখাচ্ছেন, কিন্তু শচীন দেববর্মণ মান্না দ্বে কে এ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় নির্মিত কোন ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নির্বাচন করেননি। করলেন ১৯৫০এ, *মশাল* ছবিতে একটি গান শচীনকত্তা (ঐ নামেই তিনি জনপ্রিয়) তাঁকে গাইতে অনুমতি দিলেন। পরবর্তীকালে 'চলতি কা নাম গাড়ি', 'বোম্বাই বাবু', 'কালাবাজার', 'মঞ্জিল', 'বাত এক রাত কি', 'রঙ্গিনী', 'মেরি সুরত তেরি মাঝে', 'জিদ্দি', 'জ্যোতি', 'তালাশ','ইশক্ পর জোর নেহি', 'তেরে মেরে সপনে', 'ছুপা রুস্তম' বহু বহু ছবিতে আর ১৯৬৫র ছবি *গাইড*-এ তো শচীন দেববর্মণ সুরারোপিত ও শৈলেন্দ্র লিখিত 'হে রাম তুম হারে রামচন্দ্র' হাটে মাঠে গাওয়া হত। পিতা শচীনকর্তার সুরে যেমন, তেমন তাঁর সুরকার পুত্র রাহুল দেববর্মণের সুরেও অসংখ্য প্লেব্যাক করেছেন তিনি।

হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে প্রথিতযশা এমন কোন সঙ্গীত পরিচালক নেই, যাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় গান করেননি তিনি। তালিকাটি সুবৃহৎ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন– সলিল চৌধুরী, শঙ্করজয়কিষণ, নৌশাদ, লক্ষ্মীকান্তপ্যারেলাল, বসন্ত দেশাই, কল্যাণজীআন ন্দজী, স্বপন জগমোহন, ঊষা খান্না, মদনমোহন, রবীন্দ্র জৈন, বাপি লাহিড়ী প্রমুখ। ছয় দশক ধরে গান গেয়ে তিনি কোটি কোটি শ্রোতাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন।

মনে রাখতে হবে, তিনি বাঙালি, আবার একই সঙ্গে তিনি ভারতীয়। ভারতের একজন গায়ক হিসেবে তিনি এদেশের প্রায় সমস্ত প্রদেশের ভাষাতেই সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। অতএব তাঁর সঙ্গীতের সামগ্রিক মূল্যায়ন কিন্তু হবে সর্বভারতীয় নিরিখে এবং কখনোই তা একক ব্যক্তির মাধ্যমে হতে পারবে না।

ধরা যাক *চেম্মিন* ছবিতে তাঁর পরিবেশিত একটি মালয়ালম সঙ্গীতের কথা। তাঁর স্ত্রীর মাতৃভাষা এবং হয়তো সেই নির্ভরতায় এবং স্ত্রী সুলোচনার পরামর্শেই এ গানের সঙ্গীত পরিচালক, তিনিও বাঙালি এবং কিংবদন্তি সুরকার, সলিল চৌধুরীর অনুরোধ তিনি ফিরিয়ে দেননি। তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই রচিত *চেম্মিন* (বাংলা অর্থে 'চিংড়ি') এমনিতে একটি অসাধারণ ধ্রুমপদী উপন্যাস। বাংলাসহ আঠারোকুড়িটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে যে উপন্যাসটি, এহেন বিখ্যাত বইয়ের ছায়াচিত্ররূপ (ছবিটি সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছিল) দেওয়াটা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প, স্লে ছবিতে গান গাইছেন এমন একজন শিল্পী, যিনি সেই ভাষাটি জানেন না, স্ত্রীর কাছ থেকে দিনের পর দিন মালয়ালি ভাষায় উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গী শিখে নিয়ে তিনি এমন সার্থকভাবে গাইলেন সে গান যে, সেই গানের জন্য জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত তো হয়েইছিলেন, কেরালার ঘরে ঘরে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় গৃহীত হয়েছিল সে গান। এই সাফল্যের পেছনে নির্ঘাত তাঁর অন্যতম সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ আমন আলী খাঁর অবদান ছিল, যিনি একদা মান্না দ্বে কে তিন মাস ধরে কেবল প্রতিটি অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ শিখিয়েছেন, যাকে সঙ্গীতের পরিভাষায় বলা হয় 'নুম'। উচ্চারণে হ্রস্বদী র্ঘের ব্যবধান, অক্ষরের যথার্থ ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ না জানলে যথার্থ সঙ্গীতশিল্পী হওয়া যায় না, এই ছিল গুরুর বিশ্বাস। তাই মান্না দ্বের স ঙ্গীতের অনুধ্যান আর মূল্যায়নে তাঁর সর্বভারতীয়ত্বের স্তর স্তরান্তর সম্পর্কে অবহিতি যেমন জরুরি, তেমনি যে যে ভাষায় তিনি গান করেছেন, সে সব ভাষার ঐতিহ্য ও বিকাশে তাঁর সঠিক অবস্থানটিকেও জানতে হবে।

দীর্ঘ ছ'দশক বম্বেতে বাস করায় মারাঠী ভাষার সঙ্গে সম্যক ও গভীর পরিচয় তাঁর এমনই অবিসংবাদীভাবে গড়ে উঠেছিল যে একনাথ, তুকারাম, নামদেব প্রমুখ মধ্যযুগের সন্ত কবিদের গান রেকর্ড করেন তিনি (এঁদের সঙ্গে গুরুনানক, কবীর, জোলা, রজব প্রমুখ সন্ত সাধকদের তুলনা করা যায়)। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি এইভাবে বাঙালির সংযোগ ঘটালেন, এটি মনে রাখার মত ঘটনা বৈকি। তুকারামকে অবিশ্যি অনুবাদে বহু আগেই এনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, স্বভাবত স্বতন্ত্র এই বিশ্বপ্রতিভা। না হলে এত এত গানে শ্রোতাকে নন্দিত করেও তিনি আজীবন রবীন্দ্রনাথে নতজানু হতেন না, অন্তত তিরিশটি রবীন্দ্রগান রেকর্ড করতেন না, হিন্দিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করার তাগিদ অনুভব করতেন না, আর জীবনভর রবীন্দ্রনাথকেই তাঁর আত্মার শান্তি বলে স্বীকার করতেন না।

মান্না দে সর্বভারতীয়, কিন্তু তিনি যে বাঙালিও আবার। আমাদের আলোচনার শেষ পর্বে তাই বাংলা সঙ্গীতজগতে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভূমিকার কথা সবিশেষ বুঝে নিতে চাইব। যে রবীন্দ্রভক্তির কথা বলা হল এইমাত্র, শুরুতে সে প্রসঙ্গে একটি বেদনার কথা জানাই। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩তে মান্না দ্বে কে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করবে কথা ছিল।

মান্না দে সর্বভারতীয়, কিন্তু তিনি যে বাঙালিও আবার। আমাদের আলোচনার শেষ পর্বে তাই বাংলা সঙ্গীতজগতে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভূমিকার কথা সবিশেষ বুঝে নিতে চাইব। যে রবীন্দ্রভক্তির কথা বলা হল এইমাত্র, শুরুতে সে প্রসঙ্গে একটি বেদনার কথা জানাই। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩তে মান্না দ্বে কে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করবে কথা ছিল।

বেদনার কথা জানাই। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩তে মান্না দে কে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করবে কথা ছিল। ডিসেম্বর ২০১৩তে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে নিজ হাতে তাঁর এই সম্মান গ্রহণের কথা ছিল। দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রয়াণ তাঁর এই দুর্লভ সম্মান জীবিতকালে তাঁকে দিতে পারল না। ঠিক হয়েছে তাঁর কন্যা এসে সেটি গ্রহণ করবেন।

বাংলা সঙ্গীত এবং মান্না দে বলতেই একঝাঁক শিল্পীর কথা মনে পড়ে– হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তালাত মাহমুদ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, অখিলবন্ধু ঘোষ, ভূপেন হাজারিকা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরো কত। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, উৎপলা সেন, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, নীতা সেন প্রমুখ। আধুনিক বাংলা গান, ছায়াছবির গানের স্বর্ণপ্রসূ সময় সেটা, যখন গীতিকাররূপে আমরা পাচ্ছি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্বামী), সুধীন দাশগুপ্ত, মিল্টু ঘোষ , শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের মত প্রতিভা, তেমনি সুরকাররূপে বিস্ময়াহত করছেন নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, রতু মুখোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, সুপর্ণকান্তি ঘোষ, প্রভাস দে (মান্না দের ভাই), অজয় দাস, নীতা সেন, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বাগচী, অধীর বাগচী, আর কৃষ্ণচন্দ্র ও মান্না দে নিজে। রবীন্দ্রনাথ্লনজর ল প্রমুখ সঙ্গীতবিদদের সময় সুরকার্ল গীতিকারের দ্বৈতভূমিকা এই পর্বের বাংলা গানে অনুপস্থিত, তাছাড়া এঁরা তো সঙ্গীত পরিবেশনের তৃতীয় মাত্রাতেও অন্বিত ছিলেন– রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালরাও। 'আধুনিক বাংলা গান' অভিধায় ভূষিত হতে লাগল চারের দশক থেকে মোহিনী চৌধুরী, সত্য চৌধুরী, সুপ্রভা সরকার, যূথিকা রায়, জগন্ময় মিত্র প্রমুখ শিল্পীর গান। মূলত প্রেমের গান, কথায় ও সুরে লাজুক লিরিক, মরমী আর পেলব। হিন্দি গানের জগতে মহম্মদ রফি, কিশোরকুমার, তালাত মাহমুদ বা মুকেশের জনপ্রিয়তার পাশে যেমন মান্না দে কে নিজের স্থান করে নিতে হয়েছে, তেমনি বাংলা গানের সমসাময়িক দিকপাল যাঁরা, সেই ধনঞ্জয়্লসতীনাথ্ল হেমন্তশ্যামল্ল মানবেন্দ্রর পাশে নিজ স্বকীয়তা আনার সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে। প্রতি বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে শিল্পীদের নতুন গান বেরোত সে সময়কার সোয়া তিন মিনিটের রেকর্ডে, দু'খানা করে। ঐটুকু সময়কে মাথায় রেখে কী অনবদ্য সঙ্গীত উপহার দিতেন তখনকার শিল্পীরা। মান্না দের এ সব শারদ অর্ঘ্য এখনো ক্লান্তিহীন শুনে চলি আমরা। এসব গানের কয়েকটি হল– 'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি', 'তুমি আর ডেকো না', 'একই সঙ্গে এত রূপ', 'সেই তো আবার কাছে এলে', 'আবার হবে তো দেখা', 'ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালবাসবে', 'কথা দাও আবার আসবে', 'প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন'– এমন আরো অজস্র। পুজোর প্যাডেলে প্যাডেলে মাইকে বাজত, এখনো বাজে এসব গান, কত অসংখ্য অনুষ্ঠানে বছরের পর বছর মান্না দে কে পরিবেশন করতে হয়েছে শ্রোতার তাৎক্ষণিক আবেদনকে মূল্য দিতে গিয়ে। তাছাড়া কেবল তাঁর গান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন বহু 'মান্নাকণ্ঠী' গায়ক। এ সবই তাঁর অপার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। আধুনিক গান একদিকে, অন্যদিকে বম্বের মত কলকাতাতেও বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়করূপে একদিকে তাঁর অসাধারণ সুরমুর্ছনা, অন্যদিকে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে তাঁর গানের ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীত। আমাদের আলোচনার গোড়ায় যে অর্থনীতির কিছু তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই তত্ত্বের নিরিখে চলচ্চিত্রে হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষার চলচ্চিত্রে তাঁর স্থায়িত্বের সূত্র রয়ে গেছে। পণ্য উৎপাদনে (Mass Production) যখন বাজার সম্ভাবনা (Market Potential) অর্জন করে, ভোগ্যপণ্যবাদ বা Consumerism-এ র (আমি সদর্থেই শব্দটি ব্যবহার করছি) শুভলগ্ন সেটা। অন্য অনেকের মত মান্না দে তাঁর নিজ সাধনা ও প্রতিভার সমন্বয়ে আজীবন তৃষিত করে রাখতে পেরেছেন শ্রোতাকে। নইলে উত্তমকুমারের লিপে মান্না দের ক ণ্ঠ ব্যবহারের কোন তাৎপর্য থাকে না। উত্তমকুমারের অভিনয়জীবনের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠত। উত্তম নিজে ছিলেন সঙ্গীতবিদ, অসম্ভব অনুশীলনে মনেই হত না চলচ্চিত্রে তিনি নিজে গাইছেন না, আর তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে হেমন্তের কণ্ঠের অনেকটাই সাযুজ্য ছিল। এই ত্রিবেনীসঙ্গমের জোরে উত্তম্ল হেমন্ত কিংবদন্তিপ্রতিম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এহেন উত্তমকুমার *শঙ্খবেলা* ছবিতে মান্না দের গা নে লিপ দেবেন ঠিক হল। মান্না দে যে কোন্ সনিষ্ঠতায় এতদিনকার উত্তম্ল হেমন্ত মিথ ভেঙে দিলেন, তা বোঝা যাবে 'কে প্রথম কাছে এসেছে' গানটি শুনলে। তারপর *চৌরঙ্গী* ছবির সেই বিধুর সঙ্গীত 'বড় একা লাগে', আর একইসঙ্গে *এন্টনি ফিরিঙ্গি* ছবিতে দাপুটে গলার গানগুলি, স্ত্রীর স ঙ্গীতসমূহ, আবার অন্যদিকে *ছদ্মবেশী* ছায়াছবির হালকা সুরের গান কী সুরে মানিয়ে গিয়ে উত্তম্ল মান্না জুটি তৈরি করল। শুধু কি তাই? ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্যতম সেরা শিল্পীর সঙ্গে দ্বৈতসঙ্গীতে যোগ দিলেন তিনি; হ্যাঁ, ভীমসেন যোশীর সঙ্গে। গেয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান। কীর্তনাঙ্গের গানে মাতিয়ে দিয়েছেন *শ্রীরাধার মানভঞ্জন*, আর *রামী-চ-ীদাস* গীতিনাট্যে। ছোটদের জন্য *হিংসুটে দৈত্য* আর *ছোটদের রামায়ণ* শুনলে মনে হবে, এখানেও কতখানি স্বয়ম্প্রভ তিনি।

মান্না দে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন নিজেকে। তাঁর সামগ্রিকতাকে হাতের মুঠোয় আনা দুরূহ। এটুকু বলা যায়, তাঁর সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে উজ্জ্বল সংযোজন; শাশ্বত ও দ্যুতিমান।

অন্তহীন পুরস্কারে ভূষিত তিনি– পদ্মশ্রী (১৯৭১), পদ্মভূষণ (২০০৫), দাদাসাহেব ফালকে (২০০৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গবিভূষণ (২০১৩), আরো কত কী! বিএফজেএ একাধিকবার তাঁকে শ্রেষ্ঠ নেপথ্য শিল্পীর পুরস্কার দিয়েছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে সাম্মানিক ডি. লিট। বাংলাদেশের 'রেনেসাঁ সাংস্কৃতিক পরিষদ' (ঢাকা) তাঁকে দিয়েছে 'মাইকেল সাহিত্য পুরস্কার'। এ ছাড়া 'আনন্দলোক পুরস্কার', 'বিভাকর পদক', 'পি সি চন্দ্র গ্রম্নপ পুরস্কার', 'আলাউদ্দীন খাঁ পুরস্কার' পান তিনি।

স্ত্রী সুলোচনা কেরালায় মেয়ে, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা, সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর বড় মেয়ে সুরমা ক্যালিফোর্নিয়ায় কম্পিউটার বিজ্ঞানী। ছোট মেয়ে সুমিতা কণ্ঠশিল্পী। জীবনে পাওয়ার বাকি ছিল না কিছু। শেষ বয়সে দু'টি তীব্র বেদনা তবু পেতে হল তাঁকে। এক. তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু আর দুই. বড় মেয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া। তাছাড়া জীবনের প্রান্তলগ্নে এসে বেশ কিছু টাকার আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁকে। শিল্পীরও জীবন নিরঙ্কুশ নয়।

বিশ্বের প্রায় সমগ্রটাই ঘুরেছেন গান শোনাতে গিয়ে। ২০০৬এ শেষবারের মত গান রেকর্ড করেন তিনি। টিভি সিরিয়ালে অভিনয়, তাঁকে নিয়ে ছবি 'পাগোল তোমার জন্য'তে তাঁর অভিনয় মান্না দের জীব নের বাল্ট প্রোডাক্ট। ইংরেজিতে Manna মানে তো অমৃত! তিনি তাল্টই।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ভারতের কবি, প্রাবন্ধিক

কত অসংখ্য অনুষ্ঠানে বছরের পর বছর মান্না দে কে পরিবেশন করতে হয়েছে শ্রোতার তাৎক্ষণিক আবেদনকে মূল্য দিতে গিয়ে। তাছাড়া কেবল তাঁর গান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন বহু 'মান্নাকণ্ঠী' গায়ক। আধুনিক গান একদিকে, অন্যদিকে বম্বের মত কলকাতাতেও বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়করূপে একদিকে তাঁর অসাধারণ সুরমুর্ছনা, অন্যদিকে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে তাঁর গানের ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীত।

কবিতা

দুঃখ গান

বেলাল চৌধুরী

‘একটি নিখাদ দুঃখের নির্মাণে
কেটে যেতে পারে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ,
দুঃখ বিষম ভারি বোঝা, সিন্দাবাদের বুড়োর অধিক’
বলেছিলেন কলাকোপার সাধক নদেরচাঁদ গোঁসাইর
আখড়ার এক দীন সেবক,
‘আর গান সে তো বাবা আরও দূরধিগম্য–
দুঃখ এবং গানের মিলন, তবেই না দুঃখ গান!’
‘ঘরের দেয়াল কঙ্গবেনে বাইরে নাচে প্রলয়-য়-য়-য়...
আর সুনীল খ্যাপা কয় তাইরে নাইরে না...’

গানের ভেতর প্রজ্বলিত মোমের মতন দুঃখগুলি
গলে গলে খেয়াল, গজল, মরমিয়া, বাউল হতে হতে
অন্তর্লীন স্বর্গগঙ্গা বেয়ে
অশ্রুসজল দুঃখগান, ঝর্নাধারা, সাধন ভজন!
শ্রাবণধারার মত অশ্রুজলে দ্রব হয়ে মিশে যাওয়া
চোরা স্রোতে বিলীন হওয়া,
রজধারায় আগুন কেবল আগুন
সবই তো সেই দুঃখ গানে একাকার।

দুঃখ গানের উৎস কোথায় জানতে হলে যাও চলে যাও
প্রত্নতত্ত্বের গভীর স্তরভঙ্গে শিলীভূত জীবাশ্ম কণিকায়,
গ্রহান্তরের ঝিকিমিকি নক্ষত্রসংঘের উল্কাপিণ্ডে,
কোনও বারযোষিৎ-এর নিরুচ্চার অভিমানে?
কেইবা খবর রাখে তার,
আর কেইবা বোঝে দুঃখ তার!

হিমপুষ্প

পিয়াস মজিদ

শীত এলে
দৌড়ে চলে যাই
মাঠের ওপারে।
দেখে আসি
কুয়াশায় ঢেকেছে কিনা
আমাদের কুরুক্ষেত্রগুলো।

ওখানে শান্ত এক
শিশিরের দামামায়
আসন্ন বসন্ত সব
খাক হয়ে আছে।

বর্ণগ্রাম

জুনান নাশিত

সশব্দ প্রতীক হয়ে জেগে আছে সময় ও স্মারক
একেকটি দিন একেকটি রাত যেন
নিজেই নিজের হন্তারক।

দুহাতে রক্তের বীজ
আষাঢ়ে গল্পের ফাঁকে বেড়েছে একাকী
ঝরেছে দুচোখে ঝর ঝর
তাকে ধুয়ে মুছে কীভাবে এগুবে?
কীভাবে কাঁদবে?
গলায় ছড়ানো মোহময় ধুলোস্বর;
আমাদের বর্ণগ্রাম এতদিন নিজেই পুড়েছে নিজের আগুনে
শিরায় শিরায় বাজে নিরন্তর মর্মর।

কিশোরীর পায়ে চলা পথ মুঠো মুঠো ঘোর
বহুদিন পর জেগেছে নির্ভার
অপ্রতিরোধ্য অব্যর্থতায় অহিংস প্রীতিতে
ধুলোস্বর ভেঙে আনবে নতুন এই বাঙলায়
বকুল ছড়ানো ভোর।

ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি

মিজানুর রহমান বেলাল

সাদা-কালো মানুষগুলো– জাত নিয়ে তাজা রক্ত বিসর্জন দেয়নি। ওরা পাখির ডানা দেখে, ওড়ার ইচ্ছা এঁকেছিল মনের ক্যানভাসে। স্বাধীন চেতনা পুনরুদ্ধারে, যুদ্ধ রণাঙ্গনে– নিজের রক্তে নিজেই সেজেছিল: এনেছিল স্বাধীনবিহঙ্গ।

কুমিলা- ময়নামতি লালমাটির গতরজুড়ে জড়িয়ে থাকা, সবুজঘাসে চিরনিদ্রায়– বহুজাতের মিত্রবাহিনী। খোলা আকাশের নিচে ভেসে যাওয়া মেঘের পালক দেখে, বাতাসকে বলে ওরা– এই কী আমাদের স্বাধীনতা। শ্বেতপাথরে নির্মিত একটিমাত্র ক্রুশাকৃতির স্মৃতিস্তম্ভ; এই কী আমাদের সান্ত্বনা।

হায় ঈশ্বর! ময়নামতির লিবারেশন ওয়ার সিমেট্রি কী কপোত-কপোতীর রগরগে সংলাপ কেনা-বেচার নিরাপদ বাজার। আবেগে উন্মাদ। কবরের উপর দাঁড়িয়ে শুধুই ক্লিক্ ক্লিক্ ডিজিটাল ক্যামেরার ফ্লাশ! ইতিহাস কথা বলে– এ কী সর্বনাশ...

নিজস্ব আয়নায়

অভিজিৎ বিশ্বাস

প্রত্যেকের ভেতরেই আকাঙ্ক্ষার কিছু কাহিনি থাকে।
কিছু অনুভূতিরাশি ভাল বা মন্দ
প্রকাশের পথ খোঁজে আপন ছন্দে নিজস্ব পথে
হয়তো নামী কিংবা অনামী কোন শারদ সংখ্যায়
প্রকাশিত একটি কবিতা সৃজিত আবেগে ও যত্নে
চোখের সামনে তার জন্মমুহূর্তের প্রতিটি ক্ষণ পুনর্বার
সৃষ্টিসুখের সেই আনন্দ ও বেদনা, রক্তমাংসের মানুষ
অথবা কল্পনার সৃজন যেন সেলুলয়েডে ধরে রাখা
কোন ছবির মত, শুধু সেই কবি জানে।
স্বকীয়া কিংবা পরকীয়া, প্রেম ও অপ্রেম
নিতান্তই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক যেমনই হোক না কেন
এখন সে সর্বজনীন। সারা গায়ে মাখবে জ্যোস্নাঢেউ
পাঠকের ভালবাসায়, অথবা নেহাতই
অবজ্ঞার 'ছি! এটা কবিতা হল নাকি?'
নিজস্ব আয়নার প্রতিফলনে শুধু সেই সেই কবি। একক।
কেন লিখি, রেখে কি যাই কোন পরিবর্তনের আখর
সময়ের ইতিহাস নাকি শুধুই 'ব্যক্তিগত' আমি–
শুধু এই সত্য? নাকি একটি যশাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের গভীরে
'বাঃ' বলে একটি ধ্বনি, স্বতোৎসারিত আনন্দময়!

অভিজিৎ বিশ্বাস ভারতের কবি

শাড়ি

সুমী সিকান্দার

তোমার অনুরোধে একটা সাদা রঙ শাড়ি পরে এসেছি।
সাদায় তুমি ইচ্ছামত নীলাভ্র নেশা দিলে।
পাড়ের দিকে সবুজ ঘাসের মাথায়
শিশিরকণা দিলে।
মেঘগুলোকে বেশ করে ধমকে
ছাইরঙ দিলে,
মেঘের কান্না পেলে নিজেই তার চোখ মুছিয়ে
জলরঙ বুলালে।
শাড়ির হুলুস্থুল কুচিগুলো সামলাতে গিয়ে
আচ্ছারকম নাকানি চুবানি খেয়ে
ভুল করে রানিরঙ বসিয়ে দিলে,
গোলাপী রঙ আঁকতে গিয়ে রঙ খুঁজে না পেয়ে
আমারই ঠোঁট থেকে খানিক গোলাপী ধার নিলে।
কমলা সূর্যটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে
চাঁদকে খবর দিলে জোছনাকে আনতে।
রূপালি জ্যোৎস্নার কাটাকুটি শেষ হলে
তুলিটাকে ডুবিয়ে দিলে গাঢ় লালে।
লাল ছড়ানো সাদা জমিনে
আঁচলের জরিরঙ হাজার বুটি গুনতে গুনতে রাত ঢুলছে।
রাত পালাবার আগ মুহূর্তে আঁকা শেষে
আলগোছে শাড়িটা খুলে রাখলে।

মোগো বারি বরিশাল

দুখু বাঙাল

ইঁদুরেরা গর্তে ছিল– ঢের ছিল– তারা আজ বিজয়ী শেরপার বেশে
পর্বতচূড়ায় মাতে– নৃত্যে বিলাসন।

গেঁয়ো নদী ধানসিড়ি পেরিয়ে হাজার সিঁড়ি ঠিক ঠিক ছুঁয়ে আছে
মেলা দূর প্রশান্ত-র নাভির কিনার।

চিলের খোয়াব থাকে নির্জন উঁচু বৃড়া খানিকটা আকাশ– সেও দেখ
আকাশের মত এক বৃহৎ আকাশ।

জ্যোৎস্না স্বাধীন ছিল সার্বভৌম তাকে তুমি ধরে এনে ছড়িয়েছ
কবিতা নারীর দেহে ঋদ্ধমমতায়।

যে ছিল মাথার পরে জন্মঋণ আরাধ্যের অকৃত্রিম ভার
সে এখন মাটিতে আঁচল পাতা চিরকেলে মা।

সীতা যেন, তাকে তুমি দিয়ে গেলে নির্বাসন বনে বনে– খুঁজে পেতে
চিরদিন কামনার বনলতা সেন।

তোমার কবিতার খরস্রোতা কীর্তনের জলে সাঁতার কাটার মানে
নিশ্চিত ডুবে মরা কবি ও অকবিকে।

জীবনানন্দ দাশ– 'এইসব' শব্দমালার একক তালুক যার
বাড়ি কই? মোগো বারি বরিশাল– দূর বরিশাল।

হন্যমান

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

মৃত্যুর কাছাকাছি এলে
আগুনের পাখি
মেতে ওঠে মাথার ওপরে
শরীর-মগজে
ছোটখাটো সংলাপ ছড়ায়

সাগরের কাছে এস সতর্ক রমণী
প্রমত্ত বিলোলে
বেণীটি বিছানো থাক
কৃষ্ণ বেদনায়

ওদিকে গগন যেন দর্পণধারী
এলোমেলো ঝাউসারি তীব্র হুড়োপাড়া
বে-ডর আদরে
ধমনীর শেষবিন্দু ঝরে যায়
সস্তা চাদরে

তখন,
মৃত্যুর মুখোমুখি হলে
জীবনটা বড় ছোট মনে হয়

অনিন্দিতা বসু সান্যাল ভারতের কবি

প্রবন্ধ

লোকপার্বণ নবান্ন

সৌমিত্রশেখর

নবান্ন শস্যোৎসব। আরও স্পষ্ট করে বললে ধান্যোৎসব। বাঙালির ঘরে নতুন ধান ওঠার পর সেই ধানের খাদ্যগ্রহণ করার জন্য যে আনন্দঘন আচার-আয়োজন, সেটাই নবান্ন। বাঙালির ঘরে নতুন ধান উঠত একাধিক বার। কিন্তু বছরের সূচনা-ধান্যে উৎসব হত নবান্নের। মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তীকালে সৌরবর্ষ বিভিন্ন নাম নেয়। বঙ্গদেশে এর নাম হয় বঙ্গাব্দ। নক্ষত্রের স্থিতি, প্রভাব ইত্যাদি বিচার করে এই নব অব্দের মাসগুলোর নাম দেওয়া হয় নক্ষত্রের নামানুসারেই। পুষ্যা নক্ষত্র থেকে পৌষ; মঘান নক্ষত্র থেকে মাঘ; ফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে ফাল্গুন; চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্র; বিশাখা থেকে বৈশাখ; জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ; আষাঢ়া নক্ষত্র থেকে আষাঢ়; শ্রাবণা নক্ষত্র থেকে শ্রাবণ; ভাদ্রা নক্ষত্র থেকে ভাদ্র; অশ্বিনী থেকে আশ্বিন; কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে কার্তিক মাসের নামকরণ করা হয়। শুধু অগ্রহায়ণ মাসের নামকরণ কোন নক্ষত্রের নামে হয়নি; হয়েছে এর অর্থ বিবেচনায়। অগ্র+হায়ন=অগ্রহায়ণ। 'অগ্র' অর্থ প্রথম, 'হায়ন' অর্থ বৎসর; অর্থাৎ বছরের প্রথম বা সূচনা। দুটোই সংস্কৃত শব্দ। আগে অগ্রহায়ণ থেকে বছর শুরু হত, বর্ষ গণনাও হত এখান থেকে। কারণ অগ্রহায়ণ মাসে উঠত আমন ধান। ভারতবর্ষে তখন দু'টি ধানচাষই ছিল। একটি আমন, অন্যটি আউশ। আউশ মূলত বর্ষাকালের ধান। লাগানোর পর তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি পাকে অর্থাৎ শীঘ্র পাকে বা আশু পাকে বলে এই ধানের নাম হয়েছে আউশ (আশু >আউশ)। আউশ ধানের চাল মোটা, খানিকটা লালচে, ভাত খস্‌খসে কিন্তু সুমিষ্ট। পরে অবশ্য এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন ধান হিসেবে বোরো ধান চাষ শুরু হয়। বোরো এসেছে সংস্কৃত 'বোরব' শব্দ থেকে। এখন উচ্চফলনের লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশে

নানা জাতের শংকর ধানের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের সার প্রয়োগ, সেচনলকূপ ইত ্যাদি ব্যবহার, একই জমিতে বহু শস্য চাষ ইত্যাদির এই যুগে ওই কালে প্রকৃতিনির্ভর চাষাবাদের রূপটা অনুমান করা কষ্টকরই বটে।

আমন শুধু বঙ্গদেশেরই নয়, অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন প্রধান উৎপাদিত খাদ্যশস্য ছিল। এর চাল অপেক্ষাকৃত সরু, সুগন্ধময়; ভাত জুঁইফুলের মত সাদা। সমগ্র ভারতে প্রায় দশ হাজার রকমের আমন ধানের চাষ হত। বঙ্গদেশে এর সংখ্যা চার হাজারের কম ছিল না। আমন হেমন্তের ধান। 'আমন' শব্দটি হিন্দি। এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'হেমন্ত' থেকে (হেমন্ত > আমন্ত > আমন)। আবার দেখা যায়, আজ যেমন কার্তিকঅগ্র হায়ণ মাস নিয়ে হেমন্তকাল, অতীতে তেমন ছিল না। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস মিলে ধরা হত 'হিমঋতু'। এই হিমঋতুই হেমন্তকাল হিসেবে পরিচিতি পায়। তখন হিমঋতুকে আদি ঋতু ধরে বাকি ঋতুগুলোর নামকরণ ছিল এরকম: শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। পরবর্তীকালে 'শিশিরঋতু'র নাম 'শীতকাল' হয়ে যায় এবং মাসবিচা রেও সবক্ষেত্রে এক মাস এগিয়ে আসে। ঋতু ও বর্ষ গণনার এই পর্যায়গুলো এখনও ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। অগ্রহায়ণ যে বছরের আদি মাস ছিল 'অভিধান চিন্তামণি'র মত পুরনো সংস্কৃত অভিধানেও সে কথা উলেস্নখ আছে। তা ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বাদশ তিলকের সূচনাও অগ্রহায়ণ অর্থাৎ 'কেশব' থেকে। হিন্দুদের অন্য তিলকগুলো : নারায়ণ > পৌষ; মাধব > মাঘ; গোবিন্দ > ফাল্গুন; বিষ্ণু > চৈত্র; মধুসূদন > বৈশাখ; ত্রিবিক্রম > জ্যৈষ্ঠ; বামণ > আষাঢ়; শ্রীধর > শ্রাবণ; হৃষীকেশ > ভাদ্র; পদ্মনাভ > আশ্বিন; দামোদর > কার্তিক। অগ্রহায়ণ যে বছরের সূচনামাস ছিল, তা সন্দেহাতীত। সর্বক্ষেত্রেই এই মাসের অবস্থান প্রথমে থাকার কারণে অগ্রহায়ণকে 'মার্গশীর্ষ'ও বলা হয়।

আকবরের প্রচলিত হলেও এবং আকবর বাঙালি না হলেও আকবরপ্র বর্তিত ফসলি সন অবিভক্ত বঙ্গদেশে প্রধান সাল হিসেবে হিন্দুমুসলিম নির্বি শেষে সবার কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। অথচ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু এই সন ব্যবহারে এতটা আগ্রহ দেখা যায় না। অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলিমরা হিজরি সালের চর্চায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল না, যদিও তারা জানতো সম্রাট আকবর ওই অর্থে নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন না বরং তিনি 'দ্বীনইএলাহি ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুরাও মুসলিমপ্র বর্তিত বলে ওই সাল পরিত্যাগ করে শকাব্দে বা গুপ্তাব্দে স্থিতি নেয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে দেশের এই প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় মোটেই ধর্মচিন্তা দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল না। তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার কারণেই ফসলি সন ব্যাপকভাবে প্রাত্যহিক জীবনে অনুসৃত হয়। জনগণ কর্তৃক বহুঅনুস ৃতির কারণে পরবর্তীকালে নামকরণের ক্ষেত্রে ফসলি সন 'বঙ্গাব্দ'এ পরিণত হয়েছে। ইংরেজ আগমনের পূর্বপর্যন্ত বা খ্রিষ্টাব্দ প্রচলনের পূর্ববিধি বঙ্গদেশে প্রধান সন হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল বঙ্গাব্দ। এই বঙ্গাব্দকে ঘিরেই বাঙালির বহু আচার-অনুষ্ঠানের সূচনা ও বিবর্তন ঘটেছে।

নবান্ন যেহেতু শস্যোৎসব, বিশেষ করে ধান্যোৎসব, সেহেতু নতুন ধান অর্থাৎ আমন ধান দিয়ে নানা আয়োজনের মাধ্যমে নবান্ন উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। আনন্দ ও খাদ্যটাই এখানে মুখ্য। হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত এই নবান্ন হয়। পঞ্জিকাতে এর শুভক্ষণের উলেস্নখ থাকে। অবশ্য তিথিন ক্ষত্রের কারণে কখনো কখনো এই দিনটি অগ্রহায়ণের বদলে পৌষ মাসেও পড়ে যায়। এর দিন বা তিথি যে মাসেই পড়ুক, এর কারণে আচারঅনু ষ্ঠানের কোন পার্থক্য হয় না। তবে বেশির ভাগ সময়ই নবান্ন হয় অগ্রহায়ণ মাসে। এ সময় গ্রামের সব মানুষের ঘরেই কম-বেশি ধান থাকে। বাজারে ধানের দামও থাকে কম।

অগ্রহায়ণ মাসে খেত থেকে প্রাপ্ত বিপুল খাদ্যসম্ভারে মানুষের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। আর এ কারণে অগ্রহায়ণই সাধারণত নবান্নের কাল। বাঙালির আনন্দ-আয়োজনে, বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণের অনুষ্ঠানে দেবতা ও মৃত পূর্বপুরুষগণ অনাহুত হবেন, এটা ভাবা যায় না। দেবতা আর মৃত পূর্বপুরুষদের আহ্বান জানানো, এটা তাঁদের প্রতি এক অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। দেবতা অর্থে লক্ষ্মী বা নারায়ণ পুজো। লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী। গ্রামের মানুষের কাছে ঐশ্বর্য মানে ধন; সে যুগে ধন মানেই ধান। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা নবান্নের দিন লক্ষ্মী পুজো করেন না, তারা করেন নারায়ণ পুজো। ওই একই কথা; লক্ষ্মীর বর নারায়ণ। একের

নবান্ন যেহেতু শস্যোৎসব, বিশেষ করে ধান্যোৎসব, সেহেতু নতুন ধান অর্থাৎ আমন ধান দিয়ে নানা আয়োজনের মাধ্যমে নবান্ন উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। আনন্দ ও খাদ্যটাই এখানে মুখ্য। হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত এই নবান্ন হয়। পঞ্জিকাতে এর শুভক্ষণের উলেস্নখ থাকে। অবশ্য তিথি-নক্ষত্রের কারণে কখনো কখনো এই দিনটি অগ্রহায়ণের বদলে পৌষ মাসেও পড়ে যায়। এর দিন বা তিথি যে মাসেই পড়ুক, এর কারণে আচার-অনুষ্ঠানের কোন পার্থক্য হয় না।

নবান্ন প্রতি ঘরের; প্রত্যেকের বলেই নবান্ন সবার। কোন এলাকায় খেতে ধান যখন দুধরূপ থেকে চালরূপে পরিণত হতে থাকে ওই সময়ে ‘ধানের সাধ’ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এটাও নবান্ন নয়, নবান্নের পূর্ব-আয়োজন। ‘ধানের সাধ’ একটি লোক-অনুষ্ঠান। গর্ভবতী নারীদের সঙ্গে তুলনা করে উপকরণ ও খাদ্যসামগ্রীতে কুলো বা ডালা সাজিয়ে, সম্পন্নরা সেখানে বস্ত্রসংযোজন করে উৎসর্গ করে।

বদলে অন্য। সামর্থ্য যাদের বেশি, তারা এই সুযোগে মৃত পূর্বপুরুষদেরও স্মরণ করেন, করেন স্মৃতিতর্পণ আর পি-দান। কারণ সেই পূর্বপুরুষ পরম্পরাতেই তো সে বা তারা বেঁচে আছে। আগে এ ধরনের স্মৃতিতর্পণ একটু বেশিই হত। পুরুতব্রাহ্মণরাও এসব কে উৎসাহিত করতেন। কারণ, এতে দানদক্ষিণা একটু বেশিই মেলে। এ সময়ের পুজো বা পি-দান সবই হয় নতুন চালে। সেখান থেকেই নৈবেদ্য গ্রহণ; পরে নতুন চালের অন্ন এবং পিঠাপুলিমি ষ্টান্ন। গ্রাম জুড়ে নবান্নের এ আয়োজন চলে। পিঠাপুলির মূল আ য়োজন অবশ্য অবশিষ্ট রাখা হয় পরের মাসের অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির জন্য। স্থানকালভেদে নবান্নের আয়োজনে নানা বৈচিত্র্য, নানা রীতি রয়েছে। আমন ধান খেতে সুপুষ্ট হতে থাকা অবস্থায় ফলবতী গাছ থেকে কয়েক গোছা নধর শিষ নিয়ে সুন্দর বিনুনির মত করে বেঁধে নেয় অনেক গৃহস্থ। তার পর সেটা ধানের গোলার কোণে বা গোলার দরজায় মূল ঘরের প্রধান দরজার উপরে (কিন্তু ঘরের ভেতর দিয়ে) সেটা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ঝুলিয়ে রাখে। এটা একটা লোকসংস্কার। নবান্নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই; তবু যেন এটা নবান্ন থেকে পৃথক নয়। কারণ, নতুন ধানকে শ্রদ্ধাভরে আবাহনের প্রথম পর্ব এটাই। তবে এ সংস্কারটুকু সাধারণত তারাই পালন করে থাকে, যাদের গোলা আছে, সচ্ছলতা আছে; অন্তত যাদের আকারে ছোট হলেও একটু খেত বা জমি আছে। কিন্তু নবান্ন করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের তেমন কিছুই নেই, গ্রামে শুধু স্থিতিটুকু আছে, এমন কি যারা অন্যের জমিতে ঘর তুলে থাকে, তারাও এ উৎসবে শামিল হয়, নবান্ন করে। নবান্ন প্রতি ঘরের; প্রত্যেকের বলেই নবান্ন সবার। কোন এলাকায় খেতে ধান যখন দুধরূপ থেকে চালরূপে পরিণত হতে থাকে ওই সময়ে ‘ধানের সাধ’ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এটাও নবান্ন নয়, নবান্নের পূর্ব-আয়োজন। সব অঞ্চলেই এটা আছে, তা নয়; যে সব অঞ্চলে এটা আছে, সেখানেও সবাই যে এটা করে, এমন নয়। ‘সাধ’ অনুষ্ঠান সাধারণত গর্ভবতী নারীদের জন্য আয়োজন করা হয়। ‘শ্রদ্ধা’ থেকে ‘সাধ’ ধারণার উৎপত্তি। এই অনুষ্ঠানে গর্ভবতী নারীদের স্পৃহানুযায়ী নানা ধরনের খাবারের আয়োজন ও তাকে বস্ত্রদান করা হয়। ‘ধানের সাধ’ একটি লোকঅনু ষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দুধরূপ থেকে চালরূপে পরিবর্তনশীল ধানকে গর্ভবতী নারীদের সঙ্গে তুলনা করে উপকরণ ও খাদ্যসামগ্রীতে কুলো বা ডালা সাজিয়ে, সম্পন্নরা সেখানে বস্ত্রসংযোজন করে খেতে উৎসর্গ করে। লক্ষণীয়, চালকে এখানে নারীর গর্ভস্থিত সন্তানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সত্যিই তো, যে চাল খেয়ে মানুষ বাঁচে, প্রাণ ধারণ করে, সেটা এক অর্থে জীবনেরই প্রতীক। চাল আর মানুষ সমান।

নবান্নের পূর্বরাত্র থেকে আয়োজন চলতে থাকে। বিশেষ করে বাড়ির মেয়েদের ব্যস্ততা থাকে অনেক বেশি। সূর্যের আলো ফুটবার আগেই ঘর-দোর ঝেড়ে-লেপে স্নান সমাপন করে নেয় তারা। তারপর পুজোর আয়োজন। যে যেটা করে; লক্ষ্মী বা নারায়ণ। পুজোর স্থানে নতুন ধানের চাল গুঁড়ো করে যতটা পারা যায় আলপনা দেয় নারীরা। পুরোহিত আসেন যথাসময়ে। ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। বাড়ির পুরুষেরা, বিশেষ করে ছোটরা ততক্ষণে স্নান শেষ করে উপোস করে পুজোস্থানে উপস্থিত। পুজো শেষে পরলোকগত পিতৃপরুষের উদ্দেশে পি-দানের জন্য পুজোস্থানের নির্দিষ্ট আসনে বসে বাড়ির বড় পুত্রসন্তান। পরিবারের পক্ষে সেই পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে পি-দানের জন্য উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত। তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির কনিষ্ঠ পুত্রসন্তান সে অধিকার পায়। এই উভয় পর্ব মিলে খুব যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তা নয়। পুজো ও পি- দুটো ক্ষেত্রেই নতুন চালের আয়োজন থাকে। নৈবেদ্য, অন্ন, মিষ্টান্ন, পিঠা ইত্যাদি। কাঁচা দুধকলাচাল এক ত্রে মেখে পি-দানকারী ব্যক্তি সেগুলো মুঠো ভর্তি করে নিয়ে ঘরের চালে ছিটিয়ে দেন, যাতে কাক সেগুলো খেয়ে নেয়। হিন্দুদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে: পুরাণোক্ত ভূষি-র কাক ত্রিকালজ্ঞ, তাই কাকের আহারের মধ্য দিয়েই পরলোকগত পিতৃপুরুষের প্রশান্তি সন্ধান করা যায়। এরপর বহু প্রতীক্ষিত, বিশেষ করে বাড়ির ছোটদের জন্য অতি আগ্রহের তো বটেই, প্রসাদ পাবার (‘খাবার’ না বলে সুভাষিত ভাষায় ‘প্রসাদ’ বলে) পালা। নৈবেদ্য ও শুকনো প্রসাদ বিতরণ সবার মধ্যে। ভক্তিভরে প্রসাদ মাথায় ছুঁইয়ে তার পর সেটা খেতে হয়। অনেক স্থানে পুজোতে সামান্য কিছু নতুন চাল উৎসর্গ করার নিয়ম আছে। পুরোহিত সেখান থেকে চিমটি চিমটি তুলে সবার করতলে বিতরণ করেন। এটা প্রণাম করে খেয়েই নবান্ন শুরন্ন। প্রসাদ পেয়ে ছোটদের ভোঁ-দৌড়। দৌড়োতে দৌড়োতে অনেকে ছড়া কাটে :

“নতুন ধানের খাবার,
আগাম বছর আবার।”

অর্থাৎ এবছর তো নতুন ধানের চালের খাদ্যগ্রহণ আরম্ভ হল, আগামী বছর আবার তারা এভাবে শুভ সূচনা করবে;

প্রত্যাশাটা এমন। অনেক বাড়ির ছোটরা লক্ষ্মী পুজো চলতে চলতেই ছড়া কেটে দৌড়ায়। এগুলোর একটি–

"আয় মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে,
যাক বালাই 'পরে 'পরে।"

তারা প্রতি ঘরে ধন ও ধান্যের দেবী লক্ষ্মীকে আবাহন করছে এবং কামনা করছে বালাই বা অমঙ্গল যাতে উপর দিয়ে চলে যায় বা তাদের স্পর্শ না করে। ছোটদের ছড়া কেটে এ ধরনের ছুটোছুটিতে ছোটদের মধ্যে তো বটেই, বড়দের মধ্যেও একটি উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। এ উদ্দীপনা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ছড়াতে থাকে। পুরোহিত ডেকেই নবান্নের পুজো-উৎসর্গ করতে হবে, এমন নয়। যারা সম্পন্ন গৃহস্থ তারাই সেটা করে এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পি- দিয়ে থাকে। সাধারণ পরিবারে গৃহকর্ত্রীরাই লক্ষ্মী পুজোর নিত্যপ দ্ধতি অনুসারে দেবীর সামনে নতুন ধানের নৈবেদ্য ও খাদ্য উৎসর্গ করে। এতে পুরোহিতের জন্য বাড়তি ব্যয় নেই, আয়োজনে সামান্যতা থাকলে সেটা কারো চোখে পড়বার নয়। এক্ষেত্রেও নৈবেদ্য বা শুকনো প্রসাদ সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা থালা সাজিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে নবান্নপ্রসাদ পাঠিয়ে দেয়। অনেকে অন্নপ্রসাদের আয়োজন করে, অর্থাৎ ভাতসবজির খাবার পরি বেশন করে। সবজি বলতে শীতকালীন যাবতীয় শাকসবজি, বেগুন ভাজা, করলা ভাজা, বুটের ডাল ইত্যাদি থাকে। রসুন বা পেঁয়াজের কোন কিছু থাকে না, এমন কি মসুরির ডালও এই আয়োজনে চলে না। নবান্ন যখন হয়, সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ির উঠোনে, কারও কারও 'বাইরবাড়ি'তে (বাহির বাড়ি > বাইরবাড়ি) তখনো হয়তো নতুন ধানের মাড়াই করছে কৃষিশ্রমিকেরা। এরা নবান্নের অন্ন-আয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে। অনেকস্থানে অন্নপ্রসাদের দলা পরিবেশিত হয়। দলা হল রন্ধনকৃত শাকসবজি ও অন্ন, একত্রে মেখে বলের মত গোল করে পরিবেশিত খাবার। সাধারণত সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে বা গ্রাম বা পাড়ার বহু মানুষের জন্য নবান্নের 'দলা' পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন কোন অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় মানুষ দল বেঁধে নবান্নের আয়োজন করত। সন্ধ্যার পর পাড়ার উৎসাহীরা গায়েন দল নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে নানা ধরনের গান গেয়ে যায়। এদের সঙ্গে বস্তা নিয়ে থাকে আরেক দল; এরা বয়সে সাধারণত তরুণ। এই বস্তায় যার যা সামর্থ্য সে অনুসারে নতুন ধান দেয়। তবে সংস্কারবশত অধিকাংশ লোকই সন্ধ্যার পর ধান দান করে না। সে কারণে পর দিন সকালে ওই দলের তরুণ সদস্যরা আবার পাড়ার বাড়ি বাড়ি যায়। এবার আর গায়েনেরা থাকে না, কাউকে কিছু বলতেও হয় না। পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে ওঠা নতুন ধানে তরুণদের বস্তা পূর্ণ হয়ে যায়। এই ধান দিয়েই পাড়াসুদ্ধ মানুষ একত্রে নবান্ন করত। পাড়াসুদ্ধ নবান্ন আয়োজনের দিনে আনন্দে ভাসতে থাকে গ্রামের মানুষ। সবধরনের মানুষ এই আয়োজন থেকে অন্নগ্রহণ করে।

তাহলে প্রশ্ন, নবান্ন বিশেষ সম্প্রদায়ের নাকি বাঙালির সর্বজনীন উৎসব? সন্দেহ নেই, বাঙালি হিন্দুমুসলমানসহ সকলের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হত। এখনো গ্রামে গ্রামে অনেক গৃহে নবান্ন হয়, তবে উৎসব হয় না। তাই বলে এটি কোন সম্পদায়গত উৎসব নয়। নবান্ন ধর্মস ম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির নির্ভেজাল ও নিজস্ব উৎসব। এক কালে গ্রামের সব মানুষই যে যার উপাস্যর নাম স্মরণ করে নতুন ধানের চাল ভক্ষণ আরম্ভ করত। সে সময় অধিবাসী ও ভূমিমালিকানা উভয় দিক থেকে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাই নবান্নে হিন্দুদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। আজ এ দেশে অধিবাসী ও ভূমিমালিকানার দিক থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য গবেষক মোমেন চৌধুরী তাঁর 'লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৯৯৭; পৃ. ৪) গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন : 'আগে এ উপলক্ষে [নবান্ন] কোন কোন অঞ্চলের মুসলিম মেয়েরাও লক্ষ্মীপূজা করত। কেননা, পেশার সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্পর্কটা ছিল ঘনিষ্ঠ। তবে ধর্মীয় কারণে মুসলিম মেয়েরা আর আজকাল লক্ষ্মীপূজা করে না।' নবান্নের সঙ্গে মুসলিম জনজীবনের দূরত্ব সৃষ্টির পেছনে ধর্মীয় কারণকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য মাজার বা মসজিদে উৎসর্গ অথবা খাদেমইমাম দের উপহার দিয়ে মুসলিমরা এখনো কোথাও কোথাও নবান্নসূচনা ক রে। জামালপুর জেলার বক্সিগঞ্জের কামালপুর এলাকায় অনেক হিন্দু পরিবারও আউশ ধান উঠার পর সেই ধানের চিড়ে কুটে ওই অঞ্চলের শাহ কামালের মাজারে উৎসর্গ করে তারপর তারা সেই আউশ ধানের অন্ন বা খাদ্যসামগ্রী নিজেরা গ্রহণ করে। নবান্ন কোন ধর্মের নিজস্ব উৎসব নয়, বাঙালি শস্যোৎসব এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান উৎসব।

সৌমিত্রশেখর
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন কোন অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় মানুষ দল বেঁধে নবান্নের আয়োজন করত। সন্ধ্যার পর পাড়ার উৎসাহীরা গায়েন দল নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে নানা ধরনের গান গেয়ে যায়। এদের সঙ্গে বস্তা নিয়ে থাকে আরেক দল; এরা বয়সে সাধারণত তরুণ। পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে ওঠা নতুন ধানে তরুণদের বস্তা পূর্ণ হয়ে যায়। এই ধান দিয়েই পাড়াসুদ্ধ মানুষ একত্রে নবান্ন করত।

রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধিদল

ভ্রমণ

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

রাউফুন নাহার

সাতদিন পর বাংলাদেশের মাটিতে আবার যখন পা রাখলাম, ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু। রাতে লম্বা ঘুমের পর আবিষ্কার করলাম আমি আমার ঘরে আমারি অভ্যস্ত বিছানায়। কিন্তু সাতদিন আগের আমি আর আজকের আমির মাঝে কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম একটা ফারাক। মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল গত সাতদিনে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া আনন্দঘন মুহূর্তগুলো। মনে মনে ভাবলাম, অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির ভাণ্ডারে কতকিছুই না জমা পড়ে গেল। জমে থাকা গল্পগুলো বলে হালকা হবার জন্য তাই চলে গেলাম বড়বোনের বাসায়। পাঁচবছরের ভাগ্নি ইবু দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল 'তুমি নাকি ভীমের দেশে গিয়েছিলে, ভীমের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল?' ভাবলাম, তাইতো! ভীম যেহেতু ভারতীয় কার্টুন, সেই দিক থেকে ভারত তো ভীমেরও দেশ! সাতদিনে ১০০ তরুণের একেকজন একেক আঙ্গিকে ভারতকে দেখেছি। ছোট্ট ইবু যেমন ভারতকে ভীমের দেশ হিসেবে জানে ঠিক তেমনি আমাদেরও ব্যক্তিগত পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল যার যার নিজের মত। তবে একটা ব্যাপার আমাদের সবার মাঝেই সমানভাবে উপস্থিত ছিল। আর তা হল মুগ্ধতা। হবারই কথা। বয়সটা আমাদের মুগ্ধ হবার। তার উপর অমন অজস্র রূপবৈচিত্র্য আর বিশুদ্ধ অতিথিসেবার পরশ পেলে তো ষোলআনা পরিপূর্ণ।

ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে এই দেশটির বাড়িয়ে দেওয়া হাত আর সহমর্মিতার ইতিহাস নতুন করে বলবার কিছু নেই। শিল্পসাহিত্যে, চালচলনে, ইতিহাসে, শারীরিক গঠনে ভারি মিল আমাদের।

দিনটি ছিল ২১ অক্টোবর ২০১৩, সোমবার। আমরা ১০০ বাংলাদেশি তরুণ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মিলিত হই ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সুযোগটি মিলেছিল ভারত সরকারের পক্ষ থেকেই। গতবছরের মত এবছরও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং কর্মক্ষেত্র থেকে ১০০জনকে নির্বাচন করা হয়েছিল ভারতকে খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করার জন্য। বয়সসীমা ২২ থেকে ৩৫। অনেকেরই এটাই প্রথম ভারত ভ্রমণ তথা বিদেশ ভ্রমণ। চোখে তাই আনন্দ আর কৌতূহলের ঝিলিক।

ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল সুসজ্জিত তিনটি বাস আমাদের স্বাগত জানাতে ঠায় দাঁড়িয়ে। সঙ্গে যুব মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকজন। সেই বাসে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম দিল্লির হোটেল *সম্রাট*-এ। দুপুরের আহার, বিশ্রাম সেরে আবার বাসে ওঠা। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কুতুবমিনারে। কুতুবমিনারের গায়ে নিখুঁত কারুকার্য পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এই তরুণ দলের মুগ্ধতার শুরু। পরদিন উপভোগ করলাম জামে মসজিদ, রাজঘাট, আর রেড ফোর্টএর অভিনব সৌন্দর্য। এসব স্ত ঐতিহাসিক স্থাপনার একটি বিশাল ড়ামতা হল এগুলো নিমেষেই মানুষকে বড্ড উদাস করে দেয়। সেই উদাসী হাওয়া গায়ে মাখিয়েই হোটেলে ফিরলাম। চটজলদি তৈরি হয়ে গেলাম মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রিত হোটেল *অশোক*-এ আয়োজিত নৈশভোজে অংশগ্রহণের জন্য।

অশোকএ প্রবেশের সময় সফরসঙ্গী এবং বন্ধু শুভ বলছিল, ছাত্রাবস্থায় আরেকটি দেশ থেকে এত সম্মান আর আপ্যায়ন পাব কখনো ভাবিনি।

একে একে দেখা হয়ে গেল তাজমহল, আগ্রাফোর্ট, প্রসার ভারতী, ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং পার্লামেন্ট মিউজিয়াম। পার্লামেন্ট মিউজিয়ামএ প্রবেশের কিছু মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারিনি সেখানে কি বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ভেতরে গিয়েই খেয়াল করলাম ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস। সেই ইতিহাস আমাদের কাছেও অতি আপন, অতি গর্বের। একটি হলঘরে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হল সেই সমস্ত অগ্নিমুখ যাদের দেশপ্রেম, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের মহিমায় ভারত আজ আধুনিক ভারত। হলঘর থেকে আরেকটি ঘরে গিয়ে দেখা গেল তথ্যচিত্রের সেই চরিত্ররাই জরুরি সভায় বসেছেন! যেন কাছে থেকে না দেখলে আসল এবং কৃত্রিমএর তফাৎ বোঝা মুশকিল। আরেকটি ঘর হুবহু পার্লামেন্টএর মত ক রে সাজানো। আমরা গিয়ে বসামাত্রই জওহরলাল নেহরু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। অবিকল বহুযুগ আগের সেই ভাষণ, সেই অবয়ব, সেই অভিব্যক্তি!

বুকে সম্ভাবনার আশা আর সফল ইতিহাসের দীপ্তি নিয়ে বেরিয়ে এলাম পার্লামেন্ট মিউজিয়াম থেকে। ফুরফুরে মেজাজে বাসে এসে বসলাম, কারণ তখনও একটি বড় চমক বাকি রয়ে গেছে। আর তা হল ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জামাইবাবু প্রণব মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব। আমরা সবাই বেশ পরিপাটি ও স্নিগ্ধবেশে রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ভারতের আকাশে তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশের পর থেকেই অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলাম কাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটির জন্য। আমাদের অপেক্ষার মুহূর্ত দীর্ঘ হয়নি। দরবারহলে প্রবেশ করলেন ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। তাঁর কণ্ঠে ছিল বাংলাদেশি ১০০ তরুণের প্রতি উষ্ণ অভ্যর্থনা, সফল নেতৃত্বের আহ্বান এবং বন্ধু হয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার। আমরা আনন্দিত হয়েছি, সম্মানিত হয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে কেটে যায় চার চারটি দিন। পঞ্চম দিনে কাকডাকা ভোরে আবার আকাশে ওড়া বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে। বেঙ্গালুরুতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কর্নাটক রাজ্যসভা এবং বিধানসভার অভ্যন্তরে। জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ এমন সব স্থানে যাবার সুযোগ পেয়ে আমাদের আত্মমর্যাদা যেন কয়েকগুন বেড়ে যায়। বেঙ্গালুরুতে আমরা *আইআইএমবি, ইনফোসিস* এবং দেবী শেটি হাসপাতাল দর্শনেরও সুযোগ পাই। *আইআইএমবি* বিশ্বের সেরা দশটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের একটি। মুহূর্তেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় সেখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। গল্পের একপর্যায়ে জানতে পারি বলিউডের বিখ্যাত সিনেমা *থ্রি ইডিয়টস*-এর শুটিং হয় এখানেই। তরুণদের উচ্ছ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। সবাই ব্যস্ত হয়ে যায় নিজেদের ক্যামেরাবন্দী করতে। তা দেখে ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. সুজিত ঘোষ দুষ্টুমির ছলে বললেন, 'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে *থ্রি ইডিয়টস*-এর শুটিং স্পট দেখতেই এখানটায় এসেছ।' এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক খুনসুটি আর মজা হয়েছিল।

টিপু সুলতান প্যালেস এবং *লালবাগ* দেখার মধ্য দিয়ে শেষ হয় বেঙ্গালুরুপর্ব। অর্থাৎ আমাদের সফরের ষষ্ঠ এবং শেষ দিন। এইদিন সবার মাঝেই দেখা যায় মন খারাপের ছায়া। যে দেশটি এই কয়েকটি দিন আমাদের পরম মমতায় কাছে টেনে নিয়েছিল তার জন্য, তার মানুষের জন্য মন উচাটন হওয়া খুব স্বাভাবিক। পরদিন আমাদের ফ্লাইট ছিল বেশ ভোরেই। কলকাতায় ট্রানজিট– অতঃপর বাংলাদেশ। সেই বেঙ্গালুরু থেকে মাতৃভূমি বাংলাদেশ পৌঁছনো অবধি মনের মধ্যে হাজার রকম ইচ্ছে, অনুভূতি আর স্বপ্নেরা ভিড় করেছে। প্রতিবেশী দেশের সফলগাঁথা খুব কাছে থেকে দেখে নিজের দেশের জন্য দায়িত্ব অনুভব করেছি। মনে মনে বলেছি, আমরাও পারব।

ভারতের প্রতিটি স্থাপনা এবং জাদুঘরগুলোতে দেখেছি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উপস্থিতি। যেন শৈশব কৈশোর থেকেই তাদের হাতেকলমে পরিচয় করানো হচ্ছে নিজদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, নান্দনিকতা এবং শেকড়ের সঙ্গে। *ইনফোসিস এবং আইআইএমবি*-এর সাফল্য থেকে বুঝেছি পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও মেধার সঠিক প্রয়োগ মানুষকে কত এগিয়ে নিতে পারে। ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং পার্লামেন্ট মিউজিয়ামের কাছে শিখেছি কত যত্ন নিয়ে, আপসহীনভাবে একটি দেশের ইতিহাস সংরক্ষণ করা যায় এবং তারই পথ ধরে এগিয়ে চলা যায়।

এই সাতদিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ১০০ তরুণ ছিলাম একটি পরিবার হয়ে। কলকাতা বিমানবন্দরে বিদায়বেলায় সবাই ছিলাম তাই ভীষণ আবেগাক্রান্ত। তবে ফেসবুক আইডি এবং ফোন নম্বর আমাদের যোগসূত্রের অন্যতম ভরসার জায়গা।

কবিগুরুর ভাষায় বলাই যায়– মোরা জলে স্থলে, কত ছলে মায়াজাল গাঁথি...!!!

রাউফুন নাহার শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

গ্রামের প্রান্তসীমার বড় বটগাছটি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটামোটা শেকড় বিছিয়ে আছে গোড়ায়। অনায়াসে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা যায়। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাঁচ মেয়ে বাবার দিকে তাকায়। জয়নুল জানে ওরা কেন দাঁড়িয়েছে, কেনই বা চুপ করে আছে। এই গাছের নিচে জয়নুল একা বসে থাকবে। ওরা গ্রামের পথে খানিকটুকু এগিয়ে মামার বাড়িতে ঢুকবে। দেখবে মা ঢেঁকিঘরে বসে আছে। সামনে কুলোয়-ভরা চাল

কিংবা ডালায়-ভরা কলমী শাক। একটা কিছু কাজ করছে আর মাঝে মাঝে চোখের পানি মুছছে। মেয়েরা তাকে এ অবস্থায় দেখলে প্রত্যেকেই ভাববে, বাবা তো ভুল করে দুঃখ পেয়েছে, আপনি বাবাকে মাফ করলেন না কেন? জেদ করে নিজে হারলেন, আমাদেরকেও হারালেন। আমরা কেউ কোথাও জিততে পারলাম না। মেয়েদের মনে খুব দুঃখ। কিন্তু মায়ের সামনে কোন কথা বলার সাহস ওদের নেই।

মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়নুল কোনদিকে না তাকিয়ে হাতের পুটলি বটগাছের শেকড়ের ফাঁকে এক জায়গায় রেখে দেয়। তারপর বলে, তোমরা যাও মা।

মেয়েরা বাবার দিকে এক পলক তাকায়। শিউলি বলে, আপনি কোথাও যাবেন না কিন্তু।

জয়নুল ঘাড় নেড়ে বলে, না, যাব না।

আমরা এসে আপনাকে এখানে না পেলে বাড়ি যাব না। এখানেই বসে থাকব।

বকুল বলে, আমাদের শেয়াল-কুকুর-বেজী-বানর খেয়ে শেষ করবে।

জয়নুল বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তোমরা আমাকে ভয় দেখাও কেন?

ভয় তো দেখাই না। আপনি এমন করলে সত্যি এটা ঘটবে।

এই আমি বসলাম। আমার গায়ের আঠার সঙ্গে বটগাছের আঠার জোড়া লাগল। হল তো?

হল, হল। পাঁচ মেয়ে খিলখিল করে হাসে। হাসতে হাসতে মামার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। পরক্ষণে একজন বিষণ্ন হয়। সবার ছোট পদ্ম বলে, মা আমাকে একদম ভালবাসেনি। ঠিকমত বুকের দুধ না খাইয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

কেউ কথা বলে না। পরক্ষণে আর একজন বিষণ্ন হয়। হাসুহেনা বলে, মা চায়নি আমার পড়ালেখা হোক। আমাকে স্কুলে পাঠানোর আগেই মা সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

আবারও কারো কাছ থেকে কোন কথা নাই। শুধু বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যায়। ঝড় আসার মত গভীর শব্দ নয়, হালকা শব্দ মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। পরক্ষণে আর একজন বিষণ্ন হয়। চম্পা বলে, আমার মাসিক হওয়ার সময় মা আমার কাছে ছিল না। আমি অনেক কেঁদেছিলাম। দাদী অনেক আদর করেছিল। কিন্তু মায়ের আদরের জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

কেউ কথা বলে না। মেঠো পথে ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে। চৈত্রের খাঁ-খাঁ রোদ ওদের শরীর ঝাঁঝিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে ধূলোর ধূর্ণিতে চোখমুখ ছেয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার চুল। পরক্ষণে আর একজন বিষণ্ন হয়। বকুল বলে, আমি মাকে ফারুকের প্রেমের কথা বলার আগেই মা সংসার ছেড়ে চলে যায়। আমি মাকে বলতে চেয়েছিলাম, ফারুককে সায় দেওয়া আমার ঠিক হবে কিনা। বলতে না পেরে আমি ফারুকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করি।

কারো মুখে কথা নাই। হঠাৎ করে ধুলোর ঘূর্ণি থেমে যায়। রোদের ঝাঁঝও কম লাগে। চারদিকে তাকিয়ে মেয়েদের মনে হয় মামার বাড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওদের মনে মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দ নেই। পরক্ষণে আর একজন বিষণ্ন হয়ে যায়। শিউলি বলে, আমি পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মী হলাম। যেদিন চাকরির চিঠি পেলাম সেদিন বাড়ি এসে দেখি মা নাই। আমার চাকরির চিঠিটা আমি মাকেই প্রথম দেখাতে চেয়েছিলাম। মাকে না পেয়ে সেদিন আমি ঠিক করলাম যে আমি বিয়ে করব না। সারাজীবন একাই থাকব। বাবার বাড়িটাই আমার শেষ ঠিকানা।

কেউ কথা বলে না। শুধু বিষণ্নতা সবাইকে ম্রিয়মাণ করে রাখে। পাঁচ বোন একসময় মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা একে একে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। রাশিদুন পদ্মকে জড়িয়ে ধরার জন্য টানতে গেলে পদ্ম দ্রুত দু'পা পিছিয়ে যায়। ও বকুলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। যেন মাকে ওর ভীষণ ভয়। মা ওকে ছুঁয়ে ফেললে ও একটা শক্ত কাঠ হয়ে যাবে।

রাশিদুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বস তোমরা। এই খেজুর পাতার পাটিটা আমি তোমাদের জন্য বিছিয়ে রেখেছি।

মেয়েরা হাতের পুটলিগুলো মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আমরা এইসব আপনার জন্য এনেছি।

ওগুলো পাটির উপরে রাখ।

আমরা নিজেরা টাকা জমিয়ে আপনার জন্য এসব কিনেছি।

আমি তো জানি তোমরা প্রতি বছর এমনই কর।

তাহলে আপনি এগুলো ধরবেন না কেন?

আমিতো ধরবই। এখন রাখ।

আমারটা আমি রাখব না। আপনাকে নিজের হাতে নিতে হবে।

পদ্মর কণ্ঠস্বরে গোয়ার্তুমী প্রকাশ পায়। রাশিদুনের বুক ধ্বক করে ওঠে, যেন নিজের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে ছোট মেয়েটার কণ্ঠস্বর হয়েছে। রাশিদুন ভয় পায় এবং দ্রুত হাত বাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে, কি আছে তোমার এই পুটলিতে?

পান-সুপারি-জর্দা আর জরির ফিতা। সোনালি রঙের।

জরির ফিতা দিয়া আমি চুল বাঁধব?

ইচ্ছা হলে বাঁধবেন।

আর ইচ্ছা না হলে?

পায়ে বাঁধবেন।

পায়ে বেঁধে নাচব?

আপনার যা খুশি।

অনেক পেকেছ। পাকা তাল হয়েছ। এখন গাছ থেকে পড়তে বাকি আছে।

ঘরে মা না থাকলে মেয়েরাতো এমনই হয়।

হি-হি করে হাসে পদ্ম। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও হাসে। হাসতে হাসতে ওরা পোটলা-পুটলি রেখে পাটির উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে। তখন প্রত্যেকের জন্য একটা করে কাটা ডাব নিয়ে আসে মামাতো ভাইবোনেরা। ওরা ডাবের কাটা মুখে চুমুক দিয়ে পানি খায়। অনেকটা পথ হেঁটে আসার পরে ডাব পেয়ে ওরা খুব খুশি হয়। রাশিদুন খালেদাকে বলে, দা নিয়ে এসে ডাব কেটে দিতে বল মিজানকে। ওরা শাঁস খেয়ে খুব মজা পাবে। রাশিদুন যেতে যেতে বলে, আমি তোমাদের জন্য রসের পিঠা নিয়ে আসছি। নিজের হাতে বানিয়েছি।

শিউলি খোঁচা দিয়ে বলে, মাতো মেয়েদের জন্য নিজের হাতেই বানাবে। আর কেউ বানালে মেয়েদের মন ভরবে না।

কেন, মামী বানালে খাবে না?

খাব। কিন্তু মন ভরবে না।

তোমরা কথার মার-প্যাঁচ শিখেছ খুব।

পদ্ম আবার খিলখিল হাসিতে মেতে উঠে বলে, ঘরে মা না থাকলে মেয়েরা নানা কিছু শিখে। আপনার ছোটবেলায় আপনি এতকিছু শিখেন নাই?

না। আমি অনেক শান্ত ছিলাম।

আপনার ঘরে যে মা ছিল।

তোমরা বস, আমি আসছি।

আমরা মামার বাড়িতে ঘুরব। মেয়েরা মামার বাড়ি খুব ভালবাসে। আমরাতো জানি মামী আমাদের জন্য পোলাও মুরগি রান্না করবে।

আশেপাশের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা আসে। সবাই মিলে হইচই করতে করতে বাড়ি

মাতিয়ে তোলে। হঠাৎ করে রাশিদুনের মনে হয়, বেশ তো লাগছে। ছেলেমেয়েদের এই হাসি-উচ্ছ্বাস। ওর ভাইয়ের বাড়িতে নয়, নিজের বাড়িতেই তো এমনটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি, জীবনের চারদিকে এখন কেবল ঝরাপাতার স্তূপ, ঝাড়ু দিয়ে শেষ করতে পারে না রাশিদুন। লোকটি নিজেও পাতার নিচে চাপা পড়ে আছে। মেয়েদের জন্য ওর শ্বাস বয়। রাশিদুন যেতে যেতে ভাবে, এক জীবনের জন্য একটি ভুলই যথেষ্ট। যদি সেই ভুলের আকার পাহাড়-সমান হয়। রাশিদুন হাঁড়ির পাতিল বারান্দায় এনে ছোট ছোট বাটিতে দিয়ে সবাইকে ডাকে, তোমরা সবাই পিঠা খেতে আস। রাত জেগে পিঠা বানিয়েছি। আমার মানিকরা আসবে, আমার কি অন্য কোন কাজ থাকতে পারে!

সবাই রাশিদুনের কথা শুনে বারান্দায় ছুটে আসে।

কি পিঠা, কি পিঠা?

পদ্ম হাঁড়ির দিকে তাকায়। বাটিগুলো দেখে।

ও চিতই পিঠা! কতদিন চিনির সিরায় ভিজান পিঠা খাইনি। ও হাত উল্টে আবার বলে, খাব কি করে, বানাবে কে?

চম্পা ঠোঁট উল্টে বলে, কেউ বানাবে না, কেউ না। তোর ওতো পিঠা খাওয়ার শখ কেন? আমরা আসব জেনে মা বানিয়েছেন, এখন খা। বেশি কথা আর বলবি না।

মায়ের সামনে তুই আমাকে শাসন করবি না, বলে দিলাম। তাহলে আমি বাজানের কাছে চলে যাব।

যা, চলে যা। কে মানা করেছে।

বেশ, যাচ্ছি।

পদ্ম পিঠার বাটি ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শিউলি ওর হাত চেপে ধরে বলে, বস। আমরা মায়ের সামনে ঝগড়া করব না। পিঠা খেয়ে মাকে নতুন শাড়ি পরাব, জরির ফিতা দিয়ে চুল বেঁধে দেব।

সত্যি?

হ্যাঁরে সত্যি। মিথ্যা হবে কেব?

তাহলে মায়ের চুলের বেণী আমি গাঁথব।

রাশিদুন হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে আমি তোমাদের জন্য সব করব। তোমরা আমাকে পুতুল বানিয়ে ঢেঁকির ওপর রেখে দিও। এখন তোমরা পিঠা খাও। দুপুরে তোমাদের মামী তোমাদের পোলাও-মাংস খাওয়াবে।

আর আমার বাজান বটগাছের নিচে বসে গুড়-মুড়ি খাবে।

রাশিদুন গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তোমরা খাওয়া শেষ কর।

পদ্ম ওর বাটিটা হাতে নিয়ে একলাফে উঠোনে নামে। ওর দেখাদেখি অন্যরাও তাই করে। মায়ের পাশে বসে থাকে শিউলি আর বকুল। বড় এই দুই মেয়েকে বেশিদিন কাছে পেয়েছে রাশিদুন। ওদের নিয়ে তো তার কোন দুঃখ ছিল না। ওরা তার আনন্দের সন্তান। এখন ওরা তার চারপাশে নাই। রাশিদুন আর বকুল মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। চেহারায় বলিরেখা স্পষ্ট হয়েছে, গাল ভেঙেছে, কাঁচা-পাকা চুলে মাথা ভরে আছে। চোখে উদাস দৃষ্টি। কোন্‌দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিকমত বোঝা যায় না। একজন মানুষকে ওরা তো অনেকদিন ধরে দেখছে এমন দেখেনি আগে। প্রতিবারই আর একরকম হয়ে যায় তাদের সামনে বসে থাকা মানুষটি। প্রতিবারই মানুষটি বদলায়। নিজের বাড়িতে থাকলে কি মানুষটিকে এভাবে দেখা হত। প্রতিদিন মানুষটি এমন করে বদলায় কেন?

শিউলি আস্তে করে বলে, মা।

বকুলও ডাকে, মা।

রাশিদুন দু'মেয়ের দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে বলে, তোমরা কিছু বলবা?

আপনি কি ভাল আছেন?

আছি তো। থাকব না কেন?

আপনার চেহারা দেখে মনে হয় আপনি ক্লান্ত। আর কাজ করতে পারছেন না।

কাজটা কি?

জীবনের ঘানিটানা।

রাশিদুন মৃদু হেসে বলে, ঘানিটানার দিন শেষ করে দিতে চাই।

শেষ করে দিবেন? কীভাবে?

নিজে নিজে। উপায় তো কতই আছে।

মা, মাগো!

দু'বোনে আকুল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।

তোমরা তো বড় হয়েছ। তোমাদের নিজেদের দিন হয়েছে। তোমরা নিজেরা দিন গুজরান করতে পার।

বকুল বলে, পারিতো, আমরা সব পারি। আমি বাড়িতে দালান উঠানোর কথা ভাবি।

দালান?

হ্যাঁ, দালান। ঠিক করেছি চাকরি নিয়ে দুবাই যাব। টাকা পাঠাব দালান উঠানোর জন্য।

চাকরি নিয়ে? কে তোমাকে চাকরি দিবে মাগো?

যারা বিদেশে লোক পাঠায় তাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। ব্যবস্থা একটা হবেই।

তোমার তো দেখি অনেক সাহস।

আপনাকে দেখেই তো সাহসী হতে শিখেছি। আপনি কত সাহস করে আমাদের ফেলে দিয়ে চলে আসলেন। একটুও মায়া করলেন না।

তোমরা জান তোমাদের বাজান আমাকে তালাক দিয়েছে।

বাজানতো আপনাকে ফেরত নিতে চেয়েছিল।

ফেরত যাব কেমন করে? হিলা-বিয়া করতে হবে। হিলা-বিয়া আমি ঘেন্না করি।

শিউলি চেঁচিয়ে বলে, মাগো থামেন।

ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে রাশিদুন ওর মাথায় হাত রেখে বলে, তোমার নাম শিউলি রেখেছিলাম। তুমি গন্ধ ছড়াবে। ফুলের কমলা বোঁটার রঙ থাকবে তোমার চোখে।

মাগো, আমি এখন ওই বাড়ি দেখাশোনা করি। নিজের চাকরির টাকায় সংসার চালাই। আমি আপনার বাড়িতে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে রেখেছি।

রাশিদুন দু'হাতে মুখ ঢাকে। দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসে হাস্নুহেনা। বিছানো পাটির উপর বসে বলে, মায়ের সঙ্গে তোমাদের কি কথা বুবুরা?

মাকে বলেছি আমি তোমাদের দেখাশোনা করি।

মাকে বলেছ তো যে তুমি কোনদিন বিয়ে করবে না? বাড়ি পাহারা দিয়ে রাখবে?

হাস্নুহেনার দিকে তাকিয়ে রাশিদুন বলে, বিয়ে করবে না?

বুবুতো তাই বলে। বলে, বুবু বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আমাদের কে দেখবে! তারপর হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, বুবুকে আমরা বুড়াকালে বিয়ে দেব। যখন পদ্মও শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন।

হি-হি হাসি থামে না হাস্নুহেনার। সঙ্গে সঙ্গে বকুলও হাসে। দু'বোনের হাসির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাশিদুন। এটা কেমন রসিকতা সেটা সে বুঝতে পারে না। শুধু ভাবে, হায়, ওদের জীবনে হাসির সময় ফুরোয়নি। আলাহ, ওদের হাসি যেন কোনদিন না ফুরোয়।

শিউলি হাস্নুহেনার মাথায় চাপড় দিয়ে বলে, এবার থাম। মাকে পেয়ে তোদের হাসি ফুরোয় না দেখছি। মাগো, ওরা তোমার সঙ্গে আহ্লাদ করছে।

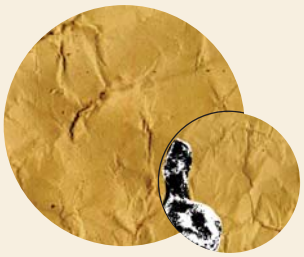

পৌষের এক গভীর রাতে দারুণ শীতে জন্ম হয়েছিল ওর। নাড়ি কাটার পরে ওর কান্না থামছিল না। সেদিন অত কেঁদেছিল কেন মেয়েটি সেকথা আজ এত বছর পরে রাশিদুনকে ভাবিয়ে তোলে। ওর জন্মের পরে আরও দুটো মেয়ে হল, কখনোই মনে হয়নি যে বাচ্চার কান্নার কারণ ভাবতে হবে। বাচ্চা তো কাঁদবেই। কাঁদাই নিয়ম। জন্মের পরপরই না কাঁদলে মনে হয় ওর বোধহয় কিছু হয়েছে।

রাশিদুন গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। তার দৃষ্টি বিষণ্ন হয়ে যায়। উদাসীও হয়। যেন তার সামনে কেউ নেই। বড়ই নিঃসঙ্গ তার এক সময়ের কলমুখর জীবন। মায়ের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ দু'জনের হাসি বন্ধ হয়ে যায়। একটুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে। একটুপরে হাস্নুহেনা মায়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, মাগো, বড় বুবুকে বলেন, আমাকে যেন ঘরজামাই দেখে বিয়ে দেয়।

ঘরজামাই কেন?

আমি শ্বশুরবাড়ি যাব না। আমাকে একটা এতিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে ভালই হবে। যার কেউ থাকবে না, সে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইবে।

বকুল বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, তুই এতকিছু ভেবেছিস হাস্নু?

ভাবব না কেন? ভাবার বয়স আমার হয়েছে।

রাশিদুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, ভাবার বয়স তো হয়েছেই।

মায়ের সাড়া পেয়ে হাস্নুহেনা তড়িঘড়ি বলে, আমি ঠিক করেছি প্রাইমারি স্কুলের টিচার হব। যাকে বিয়ে করব সেও টিচার হবে।

তারপর?

তারপর মাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। মা আমাদের সঙ্গে থাকবে। নিজের নাতিপুতিকে বারান্দায় বসে দোলনায় দোলাবে। আর গান গাইবে।

মাতো ওই বাড়িতে যাবে না।

যাবে, যাবে। আমাদের কাছে যাবে। নাতিপুতির কাছে যাবে। মায়ের পাঁচকন্যার তিরিশটা নাতিপুতি হবে।

বাজান কোথায় থাকবে?

বাজানকে আমরা বাড়ি বানিয়ে দেব। বাজানতো ওই বাড়িতে অনেকদিন থাকল। যাই।

যেভাবে দৌড়ে এসেছিল সেভাবে একলাফে উঠোনে নামে হাস্নুহেনা। উঠোন ছেড়ে দৌড়ে যায় বাড়ির বাইরে। রাশিদুন ওর বয়স কত হল তা চিন্তা করার চেষ্টা করে, কিন্তু মনে করতে পারে না। শুধু মনে হয় পৌষের এক গভীর রাতে দারুণ শীতে জন্ম হয়েছিল ওর। নাড়ি কাটার পরে ওর কান্না থামছিল না। সেদিন অত কেঁদেছিল কেন মেয়েটি সেকথা আজ এত বছর পরে রাশিদুনকে ভাবিয়ে তোলে। ওর জন্মের পরে আরও দুটো মেয়ে হল, কখনোই মনে হয়নি যে বাচ্চার কান্নার কারণ ভাবতে হবে। বাচ্চা তো কাঁদবেই। কাঁদাই নিয়ম। জন্মের পরপরই না কাঁদলে মনে হয় ওর বোধহয় কিছু হয়েছে। রাশিদুন বুঝতে পারে ওর বুকের ভেতরে একরকম হাহাকার গুমরে মরে। ও নিজেকে সামলাতে পারছে না। সেজন্য বুকের ভেতরে ফেলে আসা সময়ের কারণ খোঁজা এমন উথলে উঠবে কেন?

শিউলি মায়ের হাত ধরে বলে, হাস্নু ঠিকই বলেছে। বাজান তো অনেকদিন ওই বাড়িতে থাকল। এইবার আপনি থাকবেন। বাজান অন্যবাড়িতে থাকবে।

রাশিদুন আবার বিষণ্ন উদাস হয়ে যায়। চোখে পানি রেখে বলে, ওইটা তো তোমার বাবার বাড়ি। তারও দাদা-বাবার বাড়ি। তোমরা তাকে তুলবে কেমন করে?

সেজন্যই হাস্নুহেনা বলেছে, ও শ্বশুরবাড়ি যাবে না।

রাশিদুন মৃদু হেসে বলে, একজন-দুইজনের জন্য ঘরজামাই হবে। সবার জন্য হবে না। সমাজটা এত সোজা না।

কার জন্য সোজা না?

মেয়েদের জন্যই সোজা না।

বাজানতো পারল না আপনাকে ফেরাতে।

আমি ফিরিনি বলে। চাইলে পারত।

মাগো এত কথা থাক। আমরা আমাদের মত সমাজ বুঝব। আপনিও আপনার মত সমাজ বুঝেছেন। আপনাকে কেউ ঘাড়ে হাত দিতে পারেনি।

দূর থেকে দৌড়ে আসে চম্পা।

তোমরা কি এত কথা বল মায়ের সঙ্গে?

সুখ-দুঃখের কথা।

আমিও শুনব। বসি এখানে?

বস। তোর ইচ্ছা হলে তুইও সুখ-দুঃখের কথা বল।

আমার আবার সুখ-দুঃখ কি!

হি-হি করে হাসতে হাসতে বকুলকে জড়িয়ে ধরে ও।

ছাড় আমাকে ছাড়, ঢং করিস না।

চম্পা সোজা হয়ে বলে, তুমি আমাকে দেখতে পার না বকুল বুবু। চান্স পেলেই আমাকে ধমকাও। ঠিক আছে আমি একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

রাশিদুন আঁতকে ওঠে বলে, বাড়ি ছেড়ে যাবি? কোথায় যাবি?

ঠিক করেছি এসএসসি পাশ করলে ঢাকায় যাব।

ঢাকায়? ঢাকার পথ তুই চিনিস?

সুরমা খালার সঙ্গে যাব।

ঢাকায় গিয়ে কি করবি।

গার্মেন্টেসে কাজ করব। মাসে মাসে আমার মাকে টাকা পাঠাব।

রাশিদুন ভ্রু কপালে তোলে।

এমন করে তাকাবেন না মাগো।

তুমি আমাকে টাকা পাঠাবে না।

আপনি আমাকে শাসন করছেন মাগো।

শাসন না। নিষেধ করছি।

নিষেধ করবেন কেন?

আমি তোমাদের জন্য কিছু করিনি।

জন্ম তো দিয়েছেন।

তার জন্য তোমাদের কিছু করার দরকার নাই।

মাগো আপনি আমাদের পর করে দিচ্ছেন।

আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমরা আমাকে ভালবাস।

হি-হি করে হাসতে হাসতে চম্পা বলে, আপনি বাজানের কথাও অনেক মনে করেন। বাজানও আপনের কথা মনে করে। ফাঁকতালে আমরা রঙিন ফানুস। হাওয়াই পাখি। ডানা নাই।

চম্পা লাফ দিয়ে উঠোনে নামে। তখন বকুল হাসতে হাসতে বলে, এরপর ঠিক পদ্ম আসবে। আমরা আপনার সঙ্গে এমন করে কথা বলি নাই মাগো।

আমারও তাই মনে হয়। এইবার তোমরা বড় হয়েছ। তোমরা কত বড় হলে, আমি তাই ভাবছি।

শিউলি বলে, আমরা নিজেদের অবস্থা বোঝার মত বড় হয়েছি। আমরা বাজানকেও নানা কথা বলি। মনে হয় আমরা বুঝি বাজানের বয়সী হয়েছি। আমাদের খুব আনন্দ হয় আপনার বয়সী হতে, বাজানের বয়সী হতে। তাইলে তো আমরা বন্ধু হতে পারি।

তোমাদের কথা শুনে আমি খুব মজা পাচ্ছি। বুঝতে পারছি যে তোমরা বাবা-মার চেয়েও বড় হয়েছ।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

ছোটগল্প

দুই চক্রের দহনে

নাসরীন জাহান

রাতের কুয়াশায় ঘণীভূত হচ্ছে শীত। আর এরই কব্জায় প্রকৃতির সবকিছু মুহ্যমান। বাতাসও তার বেগ হারিয়ে স্থির, কেবল নিজের গুটিশুটি হাড্ডিসার শরীরটা নিয়ে আধছেঁড়া লেপের ভেতর থেকে প্রায়ই দমকে দমকে কেশে উঠছে মমতা।

জনমের শীত পড়ছেরে বেবাকের হাড্ডি চুইসা খাইব... উড়ে উড়ে কথাগুলো কানে আসে।

শীত অথবা অসুখ ব্যাথার কামড়ে আজ রাতে মমতা আর ছটফট করে না, নিথর পড়ে থেকে তার কেবলই মনে হয়, আজ রাতটা আর ফুরাবে না। রাতের এত কালো রঙ আগে আর দেখেনি, সকাল হলেই বা কী? কী অপেক্ষা করছে সকালে তার জন্য? তার জীবনে রাতই কী সকালই কী?

না, সকালে দিনের জাগরণ দেখে নিজেকে ভুলে থাকা যায়। বহু বহু রাত গেছে তার সাজসজ্জা গান আর আলোকবর্তিকার মাঝে উন্মাতাল হয়ে। তখন তো দিনটা ছিল তার কাছে রাত। বেহুস ঘুমে পড়ে থাকত দিনভর, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে ওঠার পর মমতা তো কোনদিন 'দিন' দেখেনি। দিনের জাগরণ কী, ভুলতে বসেছিল।

মমতা নয়, তার শবটার ওপর দিয়ে বয়ে গেলে দৈত্য নারী চুল ধরে তাকে খাড়া করায়, চড়া দাম দিয়া কিনছি কাস্টমার ভাগানির লাগ্যি? আয় আমার লগে। এরপর গলায় মদ ঢুকল, ব্লুফিল্ম দেখে দেখে 'সম্ভ্রম'এর নাম হয়ে যেতে থাকল 'ব্লেল জ্জা' পুরুষ টানার কায়দাকানুন শেখা... হাঁ পৃথিবীতে যে কতরকম শিক্ষার কত জায়গা আছে গ্রামে থাকলে কী মমতা এর ছিটেফোঁটা জানত?

কিন্তু চোখের সামনে এই বাদুরঝোলা আঁধারে সেইসব উজ্জ্বল উন্মত্ততা না ভেসে কলজের মধ্যে পেরেক ফুঁড়ে কেন এগিয়ে আসে শৈশব? কৈশোরের দীঘির জলে ঝাঁপ, শাপলা ফুলের মালা?

পুঁথির বই বেচত বাবা।

তাতেই কত কাহিনি, লাইল্লীমজনু, শিল্পিফরহাদ... যৌবনের প্রান্তে এসব কাহিনির ঘোরেই আচ্ছন্ন হয়ে পথ চলত সে।

শৈশবের সখা মনা এখন শহরে।

যখন শাপলা জলে মমতা সাঁতার কাটত মৎস্যকুমারীর মত, বলত চল বাড়ি যাই নাইলে মাইর খাইতে অইব, তখন শাপলা ফুলের মালাটা, যা জলে নির্ভার বসেই সে বানিয়েছিল, তা নিয়ে উপরে আসত, মনার গলায় পরিয়ে দিত।

পিচ্চি মনা ফনফন করে উঠত, আমি কী মাইয়া...? বলে তাচ্ছিল্যে মালা ছুঁড়ে বলত, আইজ বাড়ি চল, কাইল আমরা অশোক বনে যামু, সেইখানে অনেক পাখি বাচ্চা দিছে।

মনা শহরে গেল কৈশোরে, চাচার ওখানে থেকে পড়াশোনা করতে।

মমতার আরও কিছু সখী থাকাতে মনার বিচ্ছেদ তেমন স্পর্শ করেনি তাকে।

লাইল্লীমজনু পড়ার পর আরও না, যে তার শাপলা ফুলকে মরদাঙ্গীর কারণে তাচ্ছিল্যে ছোঁড়ে সে–।

তারপরও বুকের ভেতর অসীম বেদনার ভার। কেউ কী আসবে না তার প্রেম অস্তিত্বকে একফোঁটা নাড়িয়ে দিতে?

আচমকা যেন আসমানটায় বহুবর্ণা এক রঙধনু উঠে পুরো গ্রামটার রঙই দিল পাল্টে, বাতাসের মধ্যে মধু স্নিগ্ধ ঘ্রাণ আর আচ্ছন্নতার মধ্যে সশব্দে শিরশির করে উঠল ঝাঁকঝাঁক কবুতর, শহর থেকে একেবারে জোয়ান সুন্দর হয়ে আসা এক ছেলে যখন তাকে রক্তিম করে দিয়ে জানাল, আমিই মনা, তুমি মমতা? এত সুন্দরী হয়ে গেছ?

আচমকা একগুচ্ছ শীত ঢুকে যায় অসাবধানতায়, কুকড়ে মমতা লেপটাকে তুলে মুখ ঢাকতে চায়। ঘুঙুরের শব্দ। তবলা ধিনাক ধিনাক... প্রথমদিন ঢুকে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, এ কোন জগতে এসে পড়ল সে! সবগুলো মেয়েই কেমন আধ নেংটা বেহায়ার মত অকারণে হি হি করে। গ্রামে মনার সঙ্গে প্রেমের সময়টা যেমন স্বর্গীয় গেছে, তার সঙ্গে পালিয়ে এখানে আসার পরও স্বর্গের ঘোরটা যাচ্ছিল না। এটা কী পুঁথি বর্ণিত কোন প্রাসাদ? যেখানে বাইজীরা থাকে, সে কী এখানের রানী হবে? যখন মনা লাপাত্তা... আত্মায় একটু একটু করে শিশিরের মত ডর জমছে, দৈত্যের মত এক মহিলা বিশাল বপুর কালো আধ বয়সী এক টেকোর সামনে তাকে দেখে বলল, একদম ফ্রেস মাল, চাইর গুণ দাম দিতে হইব।

কী হচ্ছে কী এসব? মাথার মধ্যে নানা আশংকার উলম্ফন! সে হতবাক হয়ে চোখ হাতড়ায়... মনা, মনা কই?

তার শৈশব কৈশোর যৌবনকে পিষে রক্তাক্ত করে লোকটি সশব্দে তার মুখ চেপে যে যন্ত্রণাকর ঘেন্না দিয়েছিল, বমি বমি বোধে মনে হয়েছে মমতার, মুখে শিশ্ন ঢুকিয়ে লোকটি তার মুখে পেশাব যেন্নবা করেছে।

শারীরিক সম্পর্ক এমন হয়? যেন্নবা বিশাল ট্রাকের নিচে পড়ে মমতা মুমূর্ষু, শেষবারের মত খোঁজে তার স্বপ্নকে, মনা... বাঁচাও।

ও তোরে এইখানে বেইচ্যা গেছে, অরে ভুইলা যা।

না... না... আত্মার আর্তনাদ হিংস্র স্রোতের মত কেবল ধাক্কা খেয়েছে চারদেয়ালের মধ্যে।

এরপরে ক'দিন নানা রকম পুরুষ। মমতা নয়, তার শবটার ওপর দিয়ে বয়ে গেলে দৈত্য নারী চুল ধরে তাকে খাড়া করায়, চড়া দাম দিয়া কিনছি কাস্টমার ভাগানির লাগ্যি? আয় আমার লগে। এরপর গলায় মদ ঢুকল, ব্লুফিল্ম দেখে দেখে 'সম্ভ্রম'এর নাম হয়ে যেতে থাকল 'ব্লেল জ্জা' পুরুষ টানার কায়দাকানুন শেখা... হাঁ পৃথিবীতে যে কতরকম শিক্ষার কত জায়গা আছে গ্রামে থাকলে কী মমতা এর ছিটেফোঁটা জানত? বাবার পুঁথির কিসসায় আগুন জ্বলল, জীবন চলতে মমতা কতরকম মানুষকে যে দেখল, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, দেখতে যে যত ভদ্র সে রুচিতে তত বিকৃত। আশ্চর্য, এরা এক স্ত্রী নিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচে কোন কায়দায়? হরিণিয়া... ও আমার হরিণিয়া... কঁকিয়ে কঁকিয়ে যেন জীবনে শেষবারের মত কাঁদতে চায় মমতা। ভেঙে পড়তে থাকা আত্মা আর দেহ নিয়ে তার এই আকুল জলময় কান্না শুনতে শুনতে সবার কান সয়ে গেছে।

অন্ধকার জগতে ফুটফুটে মেয়েটির জন্ম হলে ফের এক নদী ভাঙ্গনের শব্দ মমতাকে চুরচুর করতে থাকে, সে পা ধরে দৈত্য নারীটির, এরে আমি আমার কাছ থেকে দূরে পাঠায়া বড় করমু, কাস্টমার দিনে ডাকলেও যামু, ওরে পড়ামু, বেশ্যা হইতে দিমু না।

দৈত্য নারীরও মন আছে মমতা জানল। পাঁচবছর বয়সে সে ভদ্র শাড়ি পরে পরিপাটি হয়ে মেয়ের কান্নার শব্দ দাবিয়ে দূর শহরের হোস্টেলে দিয়ে এল।

বছরে দু'বার সে যেত, মেয়ের হাজার আবদার বিস্ময়কর প্রশ্নেও মেয়েকে তার কাছে আনত না।

দুই.

তুমি কী ঘুমাচ্ছ?

এত রাতে তুমি? সব ঠিক আছে তো?

না না তেমন কিছু হয়নি, আমার ঘুম আসছে না।

তুমি পারোও রাশা, কাঠফাটা শীত পড়েছে বাইরে, একটি কুকুরও জেগে নেই, এসময়...।

তোমার ঘরে তো হিটার চলছে, সরি, বিরক্ত করে থাকলে রাখলাম।

আরে না না... আমিও আসলে কালকের একটা ফিচার লেখা নিয়ে ভাবছিলাম, পত্রিকার কাজ জানোই তো... তো কী করলে তোমার ঘুম হবে?

আসলে তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছি, দিনভর এ নিয়ে ভেবেছি জানো বুনো, এত অস্থির আছি বলতেই পারছি না।

তুমি প্রায়ই তোমার অস্থিরতার কথা বল, আমি সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করলে অন্য গল্প ফেঁদে বস, এত রাতে আজ যদি আবার–।

রাশা দেখে জানালা ধেয়ে আসছে নীল আলো, তার বুকের মর্মরে লবণাক্ত জল নোঙর আছড়ায়, যত দিন যাচ্ছে তত সে অনুভব করছে সে ক্রমশ বুনোর আত্মার সঙ্গে নিজেকে প্রোথিত করছে। আর এতেই ছিল তার রাজ্যির ভয়। তারই এক ভার্সিটির বন্ধুর সোর্সে বুনোর সঙ্গে তার পরিচয়। সেই বান্ধবীর প্ররোচন তাড়নায় ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে যখন উন্মাতাল দিনগুলো চলছিল কখনও কোন অভিজাত হোটেলে কখনও খুবই ব্যক্তিগত সোর্সে কোন বর্ণাঢ্য বাংলোতে যন্ত্রণার অলীক সিড়ি দিয়ে কোত্থেকে কোথায় গড়াচ্ছে অনুভব করতেই চাইত না, বুনোর সঙ্গে পরিচয়। তাকে ক্রমশ জীবনের অন্য এক মোড়ের দিকে নিতে থাকে।

মার সম্পর্কে, তার অতীত খোঁজ না নিয়ে নিজেকে তার কন্যাও নিজেকে শত শত পুরুষের তলায়? সে অন্য কোন পথ পেল না? রিপোর্টার না, একজন মানুষ হিসেবে আমি বলি, মহিলা এখন কঠিন এইডস রোগে ভুগছে, পড়ে থাকে এক কোণায় তার মুমূর্ষু কণ্ঠে কেবল একটাই ডাক, হরিণের মত চোখ ছিল বলে যার নাম রেখেছিল হরিণিয়া...। জানো মমতার প্রতি আমার যত মায়া তার কন্যার প্রতি আমার তেমনই ঘেন্না...

ভার্সিটির বান্ধবীও এই কাজ করেই নিজের পড়ালেখা চালায়, বাড়িতে টাকা পাঠায়। এখানে বান্ধবীর সূত্রেই শিখতে হয়েছে অন্য কায়দা। কারও শয্যায় তুমি যত উষ্ণতার নাটকই কর না কেন বাইরের পৃথিবীতে চলতে হবে নিজেকে সরল রহস্যে হেয়ালী নারী হিসেবে। কারণ এ কাজ করতে করতে যে ছেনালপনা এসে যায় সত্তায়, তার আঁচটুকু যেন কেউ না পায়।

কীভাবে চল তুমি?

বুনোর এই প্রশ্নে রাশা বলেছিল, এলাকার কিছু বাচ্চা আসে আমার কাছে পড়তে।

কেন অনার্স এম.এটা করছ না?

ইন্টারমিডিয়েটের আগে আগে আমার আজব এক রোগ হল, আমি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম আমি মার গর্ভ থেকেই মৃত জন্ম নিয়েছি, কখনও দেখতাম আমার মা ডাইনী বুড়ির মত আমার চারপাশে চক্কর খাচ্ছে আর আমাকে গিলে খাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আমি এদিকে পালাচ্ছি ওদিকে পালাচ্ছি।

তোমার বাবামা একই রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে বলেছ, তবে কেন মা স্বপ্নে এই চেহারায় আসত। স্বপ্নে বাবা আসত না কেন?

সেটাই তো রোগ। স্বপ্নে মা উল্টো চেহারা নিয়ে আসত, বাবা কেন আসত না এর অর্থ বুঝতাম না। খুব ছোটবেলার ঘটনা। বাবামার মৃত্যুর পর নানু হোস্টেলে পাঠিয়ে দিল। তার খরচেই পড়তাম। এক সময় নানুর মৃত্যু হলে?

তোমার দাদুদাদী?

বাবামার জীবন বাস্তবতায় বিস্তর ব্যবধান থাকায় এই জীবনে কাউকে দেখিনি, উফ্, মাথা ধরে যায় এত প্রশ্ন কর? কেউ নেই পৃথিবীতে আমার। তোমার মত সচ্ছল পরিবার জার্নালিজমে পড়া, হিটার ছেড়ে ফিচার লেখা, যা হোক আমার পরীক্ষার সময় স্বপ্নগুলো এত ভয়ঙ্করভাবে আসতে লাগল মনে হত যেন্নবা সত্যি ই আমি কোন অন্ধকার চক্করে পড়েছি। যথারীতি রেজাল্ট খারাপ হল, তখন রিয়া পাশে না থাকলে আমি হয়তো মরেই যেতাম।

রিয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় কিভাবে? এটুকু জানতে পারি?

আমরা একই স্কুলে পড়তাম, আজও ভার্সিটিতে আর আমি ওর বন্ধু রন্নমমেট হয়েও আর আগানোর সাহস পাই না।

এরপর নিরন্তর বুনোর সঙ্গে কথোপকথনে তাকে অন্তত গ্রাজুয়েট করতে যত বুনো উঠেপড়ে লাগে, তার সৌন্দর্য সরলতার প্রশংসায় মুখর হয়, ততবার তার মনে হয়েছে তার জীবনের এই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা বুনোকে বলে দেয় কিন্তু যতবারই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে 'তোমার সাথে আমার সিরিয়াস কিছু বলার আছে' শুরু করতে চায় ততবারই বুনোর শুনতে চাওয়ার আগ্রহে ওকে হারানোর ভয়ে ভীত রাশা কখনও বলেছে, রাতে স্বপ্নে দেখেছি আমি মরে ভূত হয়ে তোমার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এক জ্যোতিষী বলেছে আমি আমার প্রেমিকের হাতে মারা যাব, আমার প্রেমিক কে বলতে পারো বুনো?

আজ রাতটার নিকষ শীত আর সন্ধ্যায় বলা বুনোর কথার গুঞ্জরণ তার নিখিল ঘূর্ণিময় করে তোলে 'তোমাকে ভালবাসি রাশা', আমি জানি তুমিও আমাকে, তোমার চোখে আমি তা দেখেছি, তারপরও তোমার মুখে শুনতে চাই, বলবে?

আচমকা প্রেমশিহরিত রাশা কেঁপে উঠেছিল ভয়ে, দেহটাকে এক এক রাত এক এক জনের নিচে বিছিয়ে যত না ছেনালিপনা নাটকে, যত না শরীর ঘেন্নায়, তার চাইতে হাজার গুণ জন্মের প্রতি ঘৃণার ধিক্কারে– যেভাবেই দিয়েছে তাতে সে তো 'বেশ্যা' সম্বোধন থেকে মুক্তি পাবে না। সে তো তাই। এক ক ল্লোল গভীর স্রোত উষ্ণতায় লেপের নীচে তার দেহ যত জলদি উষ্ণ হয় তার চাইতে দ্বিগুণ ভয়ে বরফ হয়ে আসে।

বাহ্। তার জীবনের অবিশ্রান্ত আঁধার থেকে তার মুক্তি নেই।

কী? ধরে ফেলেছি না? বুনোর কণ্ঠে চমকে উঠে রাশা, কিছু গল্প ফাঁদতে চেয়েছিলে, কিছু স্বপ্ন, অথবা এত যেহেতু ইতস্তত আমার প্রেম প্রস্তাব নিঃশব্দে গ্রহণ করেছ ঠিকই, কিন্তু প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও এক্ষণি জানানোর ব্যাপারে দ্বিধা, তাই না? আমি কোন তাড়া দিয়েছি?

তুমি ঘুমাও লক্ষ্মী, আমি ফিচারটা শেষ করি। যেন হাঁপ ছেড়ে ঘুটঘুটে রাতে বাঁচার আসমান পায় রাশা। পাশের বেডে মৃদু নাক ডাকছে রিয়া। যতদিন যাচ্ছে তত দু'জন সাবধানী হচ্ছে, রোজ দেহকাজে যাওয়ার প্রশ্নই নেই, বিশ্বস্ত সূত্রে হিসেব্রেনি কেশ করে যায়।

তা তোমার ফিচারটা এবার কী বিষয়ে?

দারুণ! বুনো উচ্ছ্বসিত হয়, তুমি আমার ফিচার সম্পর্কে জানতে চাইলে! পত্রিকায় পড়ে যে প্রতিক্রিয়া দাও তার মজা আলাদা, কিন্তু যখন লিখি, তখন তুমি কী নিয়ে লিখছি জানতেই চাও না বলে এদ্দিন আমার একটা গোপন কষ্ট ছিল, আজ...।

বুক থেকে যেন হিমালয় সরে, ফলে ঝরঝরে কানে সে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে বুনোর কণ্ঠ শুনে। বুনো একটা লম্বা নিঃশ্বাস হয়ে এ কী পড়ছে? শিশু মমতা মনা নামের একজনকে শাপলার মালা পরিয়েছিল। এরপর এক এক করে সেই মমতার প্রবল প্রেমে প্রতারণা, পৈশাচিকতার তলায় রোজ ধর্ষিতা হওয়া... এক সময় তার কন্যা হল।

ম্যাট্রিক পাশ করে সেই কন্যা যখন খোঁজ লাগিয়ে শহরে এসে মাকে এই পেশায় দেখল রাগে ঘেন্নায় মার মুখে থুথু দিয়ে সে মার সঙ্গে জেদ করে মাকে ঘেন্নায় মাকে আরও রক্তাক্ত কষ্টে ভাসাতে নিজেও নিজেকে ভাসিয়ে দিল দেহ ব্যবসার মধ্যে। যে পেশায় মেয়ে বড় হতে পারে ভয়ে মা চোখে আঁধার দেখত।

বাকরুদ্ধ রাশার স্তব্ধ চোখ থেকে জল পড়ার ভাষা হারিয়ে ফেলে। মা, এই অবস্থার শিকার হয়ে? আর সে ক্ষীনা?

এসব তো হরহামেশায় ঘটে, বুনো বলে, তুমি এত চুপ মেরে গেলে যে? যা হোক আমি ফিচারটা এর পরের টুইস্টএর জন্য ই লিখেছি। মার সম্পর্কে, তার অতীত খোঁজ না নিয়ে নিজেকে তার কন্যাও নিজেকে শত শত পুরুষের তলায়? সে অন্য কোন পথ পেল না? রিপোর্টার না, একজন মানুষ হিসেবে আমি বলি, মহিলা এখন কঠিন এইডস রোগে ভুগছে, পড়ে থাকে এক কোণায় তার মুমূর্ষু কণ্ঠে কেবল একটাই ডাক, হরিণের মত চোখ ছিল বলে যার নাম রেখেছিল হরিণিয়া...। জানো মমতার প্রতি আমার যত মায়া তার কন্যার প্রতি আমার তেমনই ঘেন্না– বুনোর কণ্ঠ উত্তপ্ত শোনায়।

মুহূর্তেই রিক্ত হরিণিয়া সেই কঠিন নিকষ ঠা-য় প্রেতআ ছন্নের মত কী করে কোন কুহকের স্বপ্নহীন রুঢ় বাস্তবে সে যেন্নবা দুর ন্ত উড়ালে মার ছেড়া লেপের ভেতর পড়ে থাকা মৃদু নড়তে থাকা হাতটা ধরে 'মা' বলে ডাকতে থাকে নিজেও জানে না।

নাসরীন জাহান
কথাশিল্পী

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

ছোটগল্প

দিন শেষের রাঙা মুকুল

মীনাক্ষী সিংহ

গেটের বাইরে বাসের হর্ন শোনা যাচ্ছে।
'অবসর'-এর আবসিকদের মধ্যে ব্যস্ততা। আজ একটি এনজিও থেকে ওদের নিয়ে পূজা পরিক্রমায় যাওয়া হবে।
মহাষ্টমীর ভোরের বাতাসে লেগেছে স্মৃতির গন্ধ। মঞ্জরী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অনেকেই বাসে উঠে বসেছেন। তাড়াতাড়ি গেটের দিকে এগোতে গিয়ে কি যেন পায়ে লাগল। নীচু হয়ে তুলে নিলেন একটা চামড়ার ওয়ালেট, নিশ্চয়ই হোমের কারোর হবে। সেটা অফিসে জমা দেবেন বলে তাকালেন– এই মুহূর্তে অফিসঘর তালাবন্ধ, সামনের রিসেপশন কাউন্টারও ফাঁকা।
কি ভেবে ওয়ালেটটা খুললেন, যদি নাম বা কার্ড পাওয়া যায়, তাহলে সিকিওরিটির কাছে জমা দিয়ে যাবেন। ওয়ালেটটা খুলতেই চোখে পড়ল একটি মৃদুস্মিত মুখের ছবি– অনেকদিন আগের প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটি ফটোগ্রাফ।... বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন মঞ্জরী। বিদ্যুৎতরঙ্গের মতই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পৌঁছে গেলেন স্মৃতির সরণিতে।

এইমাত্র পাওয়া মানিব্যাগের খোপের একটা অনেকদিনের পুরনো ছবি মঞ্জরীর জীবনের সেই সাজানো ছক আর হারানো ইতিহাসের সাক্ষি। কবে কোন্ অতীতে খুব কাছের একজনকে ছবিটা উপহার দিয়েছিল সেদিনের তরুণী মঞ্জরী, নিজে হাতে লিখেছিল– 'তোমাকে'। হয়তো-বা নিজেকেও সমর্পণ করেছিল সেই একান্ত প্রিয় মানুষটির কাছে। সেদিনের চেনা ছক হঠাৎ-ই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল– নিয়তির নির্মম খেয়ালে।

দুই.

না, অষ্টমীর পূজা পরিক্রমায় যাওয়া হলনা। হঠাৎ শরীর খারাপের অজুহাতে যাওয়া বাতিল করে ফিরে এলেন ঘরে। প্রায় চলিশ বছর আগের বর্ণিল এক মহাষ্টমী তিথি কোন্ যাদুমন্ত্রবলে ফিরে এল বিবর্ণ বর্তমানে। মনে মনে হিসেব করলেন– সত্যি কেটে গেছে চারদশক। বিশ বছরের মিতশ্রী তরুণীর ছবিটা যেন মনে করিয়ে দিল– আয়ু বেড়ে যায়। কিন্তু স্মৃতির বয়স বাড়ে না।

আস্তে ওয়ালেট থেকে বার করলেন সাদাকালো ছবিটা সন্তর্পণে হাতে নিয়ে একমুহূর্ত থমকালেন, তারপর উল্টে নিয়ে দেখলেন ছবির পেছনে পরিচিত এক হাতের অক্ষরে লেখা– 'তোমাকে'

বৃদ্ধাবাসের নিঃসঙ্গ ঘরে হঠাৎই যেন এক চিত্রদর্পণের মধ্য দিয়ে অপসারণ ঘটল সময়ের। মঞ্জরী সময়কাল পেরিয়ে চলেছেন অন্তবিহীন অতীতের হারানো পথের বাঁকে। স্মৃতিপিপীলিকারা সার বেঁধে নামছে চোখের জলের ধারায়।

তিন.

সোনালি অতীত কবে কখন ধূসর হতে হতে বিলীন হল– বিশ বছরের তরুণী মঞ্জরী পৌঁছে গেল সিনিয়র সিটিজেনদের মিছিলে। তারপর 'অবসর'এর আশ্রয়ে এসে পৌঁছলেন– তাও দু 'বছর হয়ে গেল। আশৈশব সকলের মাঝে ব্যতিক্রমী বিশিষ্টতায় যিনি ছিলেন অনন্যা, ষাট পেরোতেই আজ তিনি বাতিলের দলে। এই সরল অথচ জটিল সত্যটা আজও মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। অথচ মেনে নিতেই হয়।

একমাত্র ছেলে বিদেশে সেটল করবে বলেই মাকে 'অবসর প্রবীণালয়'এ রেখে গেছে মোটা ডোনেশনের বিনিময়ে। এছাড়া তার কীই বা করার ছিল। না, সেজন্য কাউকে দোষারোপ করেন না মঞ্জরী। জীবনের অনেক সাজানো ছকই তো উল্টে গেছে।

চার.

এইমাত্র পাওয়া মানিব্যাগের খোপের একটা অনেকদিনের পুরনো ছবি মঞ্জরীর জীবনের সেই সাজানো ছক আর হারানো ইতিহাসের সাক্ষি।

কবে কোন্ অতীতে খুব কাছের একজনকে ছবিটা উপহার দিয়েছিল সেদিনের তরুণী মঞ্জরী, নিজে হাতে লিখেছিল– 'তোমাকে'। হয়তোবা নি জেকেও সমর্পণ করেছিল সেই একান্ত প্রিয় মানুষটির কাছে। সেদিনের চেনা ছক হঠাৎই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল– নিয়তির নির্মম খেয়ালে।

আজ মনে পড়ে গিয়ে উতলা হল বাষট্টির মঞ্জরী। আজকের প্রবীণা মঞ্জরী দেবীর নির্মোক ভেদ করে জেগে উঠল অতীতের 'মঞ্জি' নামের মেয়েটি।

বহু বছর আগে এমনই এক মহাষ্টমীতে মামার বাড়ির দুর্গাপূজায় এসে দেখা হয়েছিল মামাতো দাদার বন্ধু মনোময়ের সঙ্গে। মধ্যরাত্রে সন্ধিপূজার প্রদীপের আলোতে দু'জনের চোখে তারা দেখেছিল নতুন জীবনের স্বপ্ন।

যেদিন উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল মনোময়। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে মঞ্জরীর। সবার চোখের আড়ালে নিজস্ব নির্জনে ওদের কথা হয়েছিল– অপেক্ষা করা আর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি। এয়ারপোর্টে মনোময়কে বিদায় জানিয়ে সেদিন ফিরে এসে বিনিদ্র রাত কেটেছিল যে মেয়েটির তাকে কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের প্রবীণা মঞ্জরীর মাঝে? সেই অতন্দ্র রাত মঞ্জরীর জীবনে চিরদিনের মত জেগে রইল, অপেক্ষার প্রদীপ জ্বেলে। মনোময়ের ফেরার সময় যখন কাছে এল, দুই পরিবারে লাগল আসন্ন উৎসবের আয়োজন– তখনই অশনি সম্পাত।

বিদেশে এক রোগীর মৃত্যুতে সার্জারির অবহেলার জন্য কঠিন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত চিকিৎসক মনোময়কে নির্বাসিত হতে হয়েছিল দীর্ঘ সাতবছর বিদেশের কারাবাসে। সেই অমোঘ সংবাদ আজও দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফেরে মঞ্জরীকে। জীবনের সাজানো ছক যখন এলোমেলো হয়ে গেল অনিশ্চয়তায় আর অসম্মানে– তখন তার ইচ্ছেঅনি চ্ছে হারিয়ে গেল অতলান্ত আঁধারে। তারপর নিয়তির বিধানে নতুন জীবনে বাঁধা পড়তে হল। জীবনের মধুর স্বপ্ন সম্ভাবনার শেষে প্রতীক্ষার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মঞ্জরী গতানুগতিক এক জীবনের সীমানায় বন্দী হয়ে গেল। কারাপ্রাচীরে নির্বাসিত তার প্রথম প্রেম কেবল বন্দী হয়ে রইল তার হৃদয়ের চিরস্মৃত অনুভবে। আজ এতদিন পর বৃদ্ধাবাসের অফিসঘরের সামনে কুড়িয়ে পাওয়া ওয়ালেটের খোপে নিজের স্বাক্ষরিত ছবি দেখে স্মৃতিসমুদ্র উতরোল হল। এই মানিব্যাগটি কার, তার হারানো অতীতের এই ছবি, একান্ত প্রিয়জনকে দেওয়া তার স্বাক্ষরিত সপ্রেম অভিজ্ঞান এখানে কার কাছে, কেমন করে কিভাবে এল– এমন হাজারো অনুত্তর প্রশ্নে উদ্বেল হল তার হৃদয়।

বিদেশে এক রোগীর মৃত্যুতে সার্জারির অবহেলার জন্য কঠিন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত চিকিৎসক মনোময়কে নির্বাসিত হতে হয়েছিল দীর্ঘ সাতবছর বিদেশের কারাবাসে। সেই অমোঘ সংবাদ আজও দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফেরে মঞ্জরীকে। জীবনের সাজানো ছক যখন এলোমেলো হয়ে গেল অনিশ্চয়তায় আর অসম্মানে– তখন তার

পাঁচ.

কয়েক ঘণ্টা পর মঞ্জরী অফিসে এসে ওয়ালেটটি জমা দিলেন। ম্যানেজার পরেশবাবু প্রকা- স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–

– 'আপনি বাঁচালেন ম্যাডাম। এটার খোঁজে ডাক্তারবাবু কতবার যে ফোন করছেন আর আসছেন...'

– 'ডাক্তারবাবু...' মঞ্জরীর দ্বিধাজড়িত প্রশ্নের উত্তরে পরেশবাবু বললেন– 'আমাদের ওমহল মা নে পুরুষদের আবাসনের ডাক্তার মিত্র। গতকাল সন্ধ্যায় এটা ওর পকেট থেকে অসাবধানে পড়ে গিয়েছিল। আপনাকে অসংখ্য ধব্যবাদ। এক্ষুণি ওঁকে খরবটা দিতে হবে।'

এক অজানা আশা, আশঙ্কা ও সম্ভাবনার দোলাচলে কেঁপে উঠলেন মঞ্জরী দেবী। তাঁর এতদিনের নির্বাসিত স্মৃতি কি অবশেষে খুঁজে পেল আলোর ঠিকানা?

একটু পরেই অফিস ঘরে ওঁর ডাক পড়ল।

– 'ম্যাডাম, উনি বলছেন এটাই ওঁর ওয়ালেট, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু একটা দামী জিনিস ওর থেকে খোয়া গেছে।

– 'দামী জিনিস'। কেঁপে উঠল মঞ্জরীর গলা– 'ওর মধ্যে তো আটশো টাকাই ছিল, আর কিছু তো...'

– 'আপনি ভেতরে আসুন ম্যাডাম, ডাক্তারবাবুও আছেন, আপনারা বরং কথা বলে নিন। আমাকে একটু সোসাইটির অফিসে যেতে হচ্ছে'– পরেশবাবু বেরিয়ে গেলেন।

একটু ইতস্তত করে মঞ্জরী ভেতরে ঢুকলেন। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন টেবিলের সামনে বসা ভদ্রলোক। উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার বলতে গিয়ে থমকে তাকালেন।

একটি নিশ্চল মুহূর্ত, নির্বাক দৃষ্টি বিনিময়। এখন কি মহাষ্টমীর সন্ধিপুজো হচ্ছে, বুকের মধ্যে সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের স্মৃতি অনুভব ফিরে এল দু'জনের মনে। যুগান্ত পেরিয়ে দুটি অতৃপ্ত হৃদয় মুখোমুখি।

ছয়.

ডাক্তার মনোময় মিত্র আর মঞ্জরী বসু নয়– কালের সাগর পাড়ি দিয়ে ফিরে এলেন সেই দু'জন– যখন পোশাকী নামের আড়ালে দু'জন দু'জনকে ডাকতেন 'মন' বলে। কতকাল পরে এভাবে 'অবসর'এর প্রবীণ আবাসের দুই সদস্য মিলনের মুখোমুখি দু'জনে এত কাছাকাছি ছিলেন, অথচ দেখা হয়নি এতদিন। জীবন কত আশ্চর্য, কত নিষ্ঠুর আবার কত মধুর। কত কি হারিয়ে যায়– আবার ফিরেও আসে।

পুজোর ছুটিতে 'অবসর' আজ ফাঁকা। অফিসঘরের জনশূন্যতায় দুটি নির্বাক হৃদয় আজ মুখোমুখি। অনেক কথা, অনেক প্রশ্ন, অনেক অনুযোগ, অনেক অভিমান রইল অনুচ্চারিত। দুজনেরই মনে মনে গুঞ্জরিত হল প্রিয় কবিতার কলি–

'কথা ছিল দেখা হবে
অখ- সময়ে আর অনন্ত জগতে
আমি পথ চেয়ে থাকব।'

মহাষ্টমীর সাঁঝবেলায় দুটি হৃদয়ের সাঁঝবাতি যেন নতুন করে জ্বলে উঠল।

সাত.

অঘটন আজো ঘটে। 'অবসর' প্রবীণালয়ের আবাসিকরা দেখল নতুন এক দৃশ্য। এই হোমের দুই মহলের দুই প্রবীণ আবাসিক আজ ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের নতুন আবাসে, একা একা নয়– দু'জনের নবনীড়ে। গাড়ি ছেড়ে দিল। 'অবসর' ধীরে ধীরে বিন্দুর মত দূরে চলে যাচ্ছে। এতদিনের সাথীরা মিলিয়ে যাচ্ছেন, রেখে যাচ্ছেন শুভেচ্ছার স্মৃতি সৌরভ।

এই 'অবসর'কে ভুলতে পারবেন না এঁরা দু'জন। এখান থেকেই তো উজান পথে আবার নতুন জীবনে ফেরা। মঞ্জরীর হাতে হাত রাখলেন মনোময়–

– 'এবার আমার ছবিটা দাও–'

– 'মানুষটাকে ফিরে পেয়েও ছবিটার দরকার?'

– 'মানুষটি তো আমাকে ছেড়ে ছিল এতকাল, আর ঐ ছবিটা যে আমার চলিশ বছরের সঙ্গী। তাছাড়া ওটার জন্যই তো তোমাকে ফিরে পেলাম।'

– 'আমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বিপদ বাড়বে, মন। তুমি তো জানো না আমার হৃদযন্ত্রের একটা ভালভ অকেজো হয়ে গেছে। এবার চিরতরে বন্ধ হবার পালা।' মৃদু হেসে পুরনো দিনের সুরে বললেন মঞ্জরী।

– 'আর তুমি তো জানো, আমি হৃদয়ের কারবারী। ভুল মামলায় বিদেশে মিথ্যে দণ্ড পেয়েছিলাম বলে জীবনে অনেক দণ্ড ভোগ করেছি। কিন্তু তোমার হৃদয় আজো আমার কাছেই বাঁধা। আর ডাক্তারিটা ছেড়ে দিলেও একেবারে ভুলে যাইনি। আমাকে তুমি ভরসা করতে পার।'

মনোময়ের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে কত যুগ পেরিয়ে হাত রাখলাম মঞ্জরীর। দু'জনের প্রথম দেখার মহাষ্টমীর দিন মনে এল, পৌঁছল চারদশক পরের মহাষ্টমী তিথিতে। দু'জনে দু'জনের হাত ধার রইলেন একান্ত নির্ভরতায়, গভীর ভালবাসায়। এই অনুভব অবিশ্বাস্য তবুও অখ- সত্য, একটি মুহূর্ত যেন অনন্তকাল।

'একটি নিমেষে দাঁড়াল সরণি জুড়ে
থামিল কালের চির চঞ্চল গতি'...

মীনাক্ষী সিংহ ভারতের শিক্ষাবিদ, কথাকার

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

ভারত বিচিত্রার পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India- ABSSI)র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রার* এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআরবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআইএর কর্মকা- এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রার* ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

অনুবাদ গল্প

নামের খোঁজে

পি. সত্যবতী

এই সংসারের ভার নেবার আগে তার বয়স ছিল কম। শিক্ষিত মেয়ে, বুদ্ধিমতী, পরিহাসপ্রিয়– সবচেয়ে বড়, তার আচার-আচরণে সব সময় একটি সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত।

তার সুরুচি ছিল, রূপ তো ছিলই। তার সঙ্গে তার বাবার দেওয়া নগদ বরপণের টাকা পেয়ে এক যুবক তার গলায় গোপন তিনটি পবিত্র বন্ধন এঁটে তাকে তার সংসারে গৃহিণী করে নিয়ে এল। বলল, 'দেখ, এই তোমার সংসার।' মেয়ে থেকে একেবারে ঘরের সর্বময় কর্ত্রী। সে তৎক্ষণাৎ কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারা ঘর দেওয়াল চিত্র-বিচিত্র এঁকে ভরে ফেলল। আর ঘরের মেঝেয় আঁকল মুগ্‌গুলু, মানে ময়দা গোলার আলপনা। যুবকটি শতমুখে তার হাতের কাজের প্রশংসা করতে লাগল। 'তোমার আঁকা আলপনাগুলো তো ভারী সুন্দর। বাহ।' সে তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, 'এ কাজ, বিশেষ করে, ওই মেঝের মুগ্‌গুলুর তুলনা হয় না। কাজটা তুমি ভালভাবে আঁকড়ে

সহসাই একদিন বুরুশ দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করতে গিয়ে আনমনে সে নিজেকে শুধাল, ‘কী যেন নাম আমার, কী যেন...? এতদিন মনে ছিল বেশ– আর তো মনে পড়ছে না। এমন হল কেন– নাম কেন মনে পড়ে না?’ সে প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মত জেগে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। কাপড়-ঝুড়ি চিত্র করা ছেড়ে সোজা খোলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

থাক, বুঝলে?’ এ কথায় মেয়েটি মনে মনে এত উৎসাহিত হল যে, এই শিল্পকাজকে সে তার জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগল। সারাদিন ঘর ধোয় মোছে আর বর্ণালীর নানা রঙে তাকে রঞ্জিত করে তোলে। নিজেদের কাপড়-চোপড়, দরজাজানালার পর্দা, ঝুড়ি– সব সে একের পর এক নিজের হাতে দামী রঙে এঁকে চলে। এই এক নেশা তার মাথায়, তার জীবন ওই রঙিন নকশার মতই বয়ে যেতে থাকে।

সহসাই একদিন বুরুশ দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করতে গিয়ে আনমনে সে নিজেকে শুধাল, ‘কী যেন নাম আমার, কী যেন...? এতদিন মনে ছিল বেশ– আর তো মনে পড়ছে না। এমন হল কেন– নাম কেন মনে পড়ে না?’ সে প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মত জেগে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। কাপড়-ঝুড়ি চিত্র করা ছেড়ে সোজা খোলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপারে গলির মধ্যে সোজাসুজি এক বাড়ির দেয়ালে ঝোলানো নামফলক চোখে পড়ে। মিসেস এম. সুহাসিনী, এমএ, পিএইচ.ডি, প্রিন্সিপাল– ...কলেজ। সে চিন্তা করতে লাগল, প্রতিবেশীদের মত তারও একটা নাম থাকারই কথা। কিন্তু সে নাম ভুলে গেল কী করে! আঁকার দক্ষতায় মগ্ন হয়ে সে তার নিজের নামপরিচয় খুই য়ে ফেলল। তার মন একবারে অস্থির হয়ে উঠল। সেদিনের মত কোনমতে নিজের হাতের কাজ শেষ করতে পারল।

ইতোমধ্যে বাড়ির ঠিকে কাজের মেয়েটি এসে গেছে। দেখে ভরসা জাগল– এই মেয়েটা হয়তো তার নাম মনে করিয়ে দিতে পারবে। সে জিজ্ঞেস করল, ‘হ্যাঁ গা মেয়ে, আমার নামটা কি তোমার মনে পড়ে?’

‘এ কী কথা বলছেন, দিদি? গিন্নীমার নাম আবার কে কবে মনে রাখে? এত বড় পেলায় ধবধবে একখানা বাড়ির মালকাইন তুমি, এই জানাই তো সব–।’ কাজের মেয়েটি বলল।

‘তা অবশ্যি ঠিক, তুমি বা কি করে মনে রাখবে?’ মেয়েটি ভাবল।

এ সময় তার ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে এল।

মেয়েটি চিন্তা করল, নিশ্চয়ই অন্তত তার সন্তানেরা তাদের মায়ের নামটা মনে করে রেখেছে। সে আগ্রহের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ রে, তোরা কি তোদের মায়ের আসল নাম জানিস? বল না, জানিস কিনা? ’

তারা হতবাক হয়ে তাদের মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

‘তুমি আমাদের মা, তোমার নাম মা– আমরা তো তাই জানি। যেখানে যাই সবাই বলে তুমি অমুকবাবুর ছেলে, অমুকবাবুর মেয়ে। আমরা বাবার নাম জানি, মি. মূর্তি। তোমার নামে কখনও কোনও চিঠিও তো আসতে দেখি না। নাম কী করে জানব?’

তাদের সরল-সোজা যুক্তি মেয়েটি অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে ভাবতে থাকে, তাই তো, আমার কাছে কে আর চিঠি লিখবে? মাবাবা মা সেদু ’মাসে একবার হয়তো ফোন করে। ছেয়েমেয়েরা ফোন ধরলে হয়তো বলে, তোদের মাকে ডেকে দে। আমার বোনেরা নিজের নিজের ঘর চিত্রকারীর কাজে ব্যস্ত থাকে। যদিবা কখনও কোন বিয়েবাড়ি, না হয় কুমকুম উৎসবে দেখা হয়, তারা হয় খাওয়ার গল্প, নয়তো নতুন কোনও মুগ্‌গুলুর নক্সা নিয়ে এমন গালগল্প জুড়ে দেয় যে, চিঠি লেখার আর দরকার বোধ করে না। মেয়েটি ক্রমে হতাশ আর অস্থির হয়ে পড়তে থাকে। মনের মধ্যে নিজের আসল নাম খুঁজে পাওয়ার আর্তি ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে।

ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী এক মহিলা কুমকুম উৎসবে তাকে নিমন্ত্রণ করতে তার বাড়িতে আসে। মেয়েটি নানা কথার ফাঁকে তাকেও কথাটা একবার জিজ্ঞেস করে বসে। মহিলা ফিক ফিক করে হাসতে থাকে কথা শুনে। ‘কথাটা যখন বললে, জবাব একটা দিতেই হয়। তুমি তো ভাই নিজের নাম কোনদিন বলনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। সাদা রঙের ডানহাতি বাড়ি, ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজারের বউ, ওই যে সুন্দরী, লম্বামত বউটি– এভাবেই তো আমরা তোমার পরিচয় দিয়ে থাকি। এর বেশি কিছু বলাবলির তো দরকার হয় না।’ তার কাছে প্রায় দুর্বোধ্য এই কথাক’টি মহিলা বলতে পারল।

এসব কথায় তার কৌতূহল মিটবে না। ছেলেমেয়ের বন্ধুরা তাকে কমলার মা, না হয় কাকিমা, পিসিমা বলে জানে। এখন কেবল তার স্বামী এই সংকটমোচনের ভার নিতে পারে।

রাত্রে খাওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করল, দেখ, একটা ব্যাপার হয়েছে। আমি আমার নামটা কিছুতে মনে করতে পারছি না। মনে থাকলে তুমি যদি আমায় মনে করিয়ে দাও–’

স্বামী বেচারা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, ‘এমন কথা তোমার আজ হঠাৎ কেন মনে হল, কে জানে? বিয়ের পর থেকে আমি তো ওগো হ্যাঁগো সম্বোধনে কাজ সারছি। তুমিও তো তাতে কখনও আপত্তি করনি যে, তোমার আলাদা একটা নাম আছে, সে নামে তোমাকে ডাকলে বেশি খুশি হও। সবাই তোমাকে মিসেস মূর্তি বলে ডাকে– ডাকে না? হঠাৎ এমন কী হল যে অন্য রকম ভাবতে শুরু করলে?’

‘না, মিসেস মূর্তি নয়।’ যন্ত্রণায় কাতরে উঠে সে বলল, ‘না, আমি আমার নিজের নাম চাই– কিন্তু কী করে হবে– সে নাম আমি যে ভুলে গেছি–’

তার স্বামী তাকে সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, ‘আরে বাবা, তাতে কী এমন যায় আসে? যে নাম ভুলে গেছে তা বাদ দিয়ে নতুন নাম একটা নিয়ে নাও– যে কোনও একটা

ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী এক মহিলা কুমকুম উৎসবে তাকে নিমন্ত্রণ করতে তার বাড়িতে আসে। মেয়েটি নানা কথার ফাঁকে তাকেও কথাটা একবার জিজ্ঞেস করে বসে। মহিলা ফিক ফিক করে হাসতে থাকে কথা শুনে। ‘কথাটা যখন বললে, জবাব একটা দিতেই হয়। তুমি তো ভাই নিজের নাম কোনদিন বলনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। সাদা রঙের ডানহাতি বাড়ি, ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজারের বউ, ওই যে সুন্দরী, লম্বামত বউটি– এভাবেই তো আমরা তোমার পরিচয় দিয়ে থাকি।

গৃহকর্ত্রী মেয়েটি তারপর ঘরের আলমারির সবগুলো তাক, তাকের শাড়ি– পট্টবস্ত্র, সিফন, তাঁত, ভয়েল, রঙ মিলিয়ে কেনা বাউজ, পেটিকোট– হাতের কঙ্কন, পুঁতি আর মণিমুক্তোর অলংকার, চুলের কাঁটা, কুমকুম রাখার রুপোর কৌটো, রুপোর থালা, গোলা চন্দন রাখার রুপোর পাত্র সব কিছুর ভাঁজে ভাঁজে, তলায় খুঁজে দেখল। কোথাও সার্টিফিকেট পাওয়া গেল না।

'আরে সারদা! উঃ, কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা, বল্ তো?' বান্ধবীটি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। গৃহকর্ত্রী মেয়েটি এতক্ষণ এতদিন যাবৎ যেন একগলা তৃষ্ণা নিয়ে জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে মরতে বসেছিল। বান্ধবীর মুখে তার নামটি উচ্চারিত হতে শুনে ফোঁটা ফোঁটা জলে তার সমস্ত গলা, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেল। বান্ধবী যেন তাকে নতুন জীবন দান করল।

নাম।'

সে বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'তোমার সত্যনারায়ণ মূর্তি নামটা বদলে শিব রাও, না হয় সুন্দর রাও করতে বলি, তুমি তা মেনে নেবে তো? ওসব কোনও যুক্তি নয়, আমি শুধু আমার নিজের আসল নামটা জানতে চাই।'

'বেশ তো–' স্বামী বলল, 'তুমি শিক্ষিত মেয়ে। তোমার স্কুলক লেজের সার্টিফিকেটে তোমার নাম থাকারই কথা।'

গৃহকর্ত্রী মেয়েটি তারপর ঘরের আলমারির সবগুলো তাক, তাকের শাড়ি– পট্টবস্ত্র, সিফন, তাঁত, ভয়েল, রঙ মিলিয়ে কেনা বাউজ, পেটিকোট– হাতের কঙ্কন, পুঁতি আর মণিমুক্তোর অলংকার, চুলের কাঁটা, কুমকুম রাখার রুপোর কৌটো, রুপোর থালা, গোলা চন্দন রাখার রুপোর পাত্র সব কিছুর ভাঁজে ভাঁজে, তলায় খুঁজে দেখল। কোথাও সার্টিফিকেট পাওয়া গেল না। তখন মনে পড়ল বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সেগুলো সে আর সঙ্গে করে আনার কথা ভাবেনি।

সে বলল, 'মনে পড়েছে, আমি ওগুলো এ বাড়িতে নিয়ে আসিনি। আমি একবার ওগুলো খুঁজে বের করতে বাপের বাড়ি যাব। দু'একদিন লাগবে আমার ফিরতে।'

তার স্বামী একটু বাঁকাভাবে বলল, 'ভাল কথা। নামের খোঁজে যাচ্ছ তো, না আর কিছু? কিন্তু তুমি গেলে ঘর বুরুশ দিয়ে ধোয়ার কাজ কে করবে? কাজের মেয়েটা তো এক নম্বর ফাঁকিবাজ।'

তা অবশ্য ঠিক। স্বামী অফিসের কাজ নিয়ে আছে, ছেলেমেয়েরা নিজেদের পড়াশোনায় ব্যস্ত। তাছাড়া সে ছাড়া একাজ কেউ ভাল করে জানেও না।

কিন্তু নিজের নাম ছাড়া কেউ কি বাঁচতে পারে! যতদিন একথাটা তার মাথায় খেলেনি ততদিন বেশ কাটছিল দিনগুলো। এখন যেন মনে হচ্ছে নিজের নাম ভুলে বাঁচার মত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

সে বলল, 'যা হোক, দুটো দিন যে করে হোক চালিয়ে নাও। আমি বোঝাতে পারব না, একটা নাম ছাড়া বেঁচে থাকা আমার পক্ষে কতটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

সে কোনমতে বাড়ি থেকে বেরুতে পারল।

হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ি এসে উঠতে দেখে সবাই বেশ অবাক হল। বাবা বললেন, 'হঠাৎ কি মনে করে এলি? জামাই, ছেলেমেয়েরা সব ভাল তো? তুই এভাবে একাই বা কেন এলি?'

বাবামার শরীর স স্পর্কে আন্তরিকভাবে খোঁজখবর নেওয়ার পরেও তার মনের সংশয় দূর হল না। কেন সে এখানে আজ এসেছে একথা নতুন করে মনের মধ্যে আউড়ে নিয়ে সে করুণ সুরে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মা, বলতো, আমার আসল নামটা কি?'

মা বললেন, 'সে কী কথারে! তুই আমাদের বড় মেয়ে। পড়াশোনা শিখিয়ে বিএ পাস করিয়েছি। পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে তোর বিয়ে দিয়েছি। তোর দু'বার বাচ্চা হবার সময় হাসপাতালের সব খরচ আমরা করেছি। তোর দুটো ছেলেমেয়ে, আমাদের জামাই ভাল চাকরি করে– কী সুন্দর তার স্বভাবটি। ছেলেমেয়েদের কত সুন্দর ব্যবহার করতে শিখিয়েছিস–'

'আমি তোমার কাছে ইতিহাস শুনতে আসিনি মা। আমি আমার নাম জানতে চাই। বলতে না পার, আমার সার্টিফিকেটগুলো কোথায় আছে যদি একবার বলতে পার।'

মা বললেন, 'তা ঠিক বলতে পারব না। পুরনো আলমারির সব কাগজপত্র বাতিল করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওটার পালায় কাচ বসানো হল কিনা। কিছু দরকারি কাগজপত্র অবশ্যি ছাদের চিলেকোঠায় সরিয়ে রাখা হয়েছে। কাল সেসব খুঁ জে দেখবখন। আজ তুই বিশ্রাম কর, চান করে খাওয়াদাওয়া সেরে নে।'

মেয়েটি চানখাওয়া সবই করল, কি ন্তু ঘুম এল না চোখে। এবাড়িতে থাকার সময় গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যখন মুগ্‌গুলু নক্সা করত তখন কী ভেবেছে ভবিষ্যতে এমন একটা সমস্যা তার সামনে আসবে, সে তার নিজের নাম ভুলে যাবে।

বিকেল ঘনিয়ে এল। তখনও চিলেকোঠায় ঘরে পুরনো ফাইলপত্র ঘাঁটা শেষ করতে পারল না। মন বিষাদে ভরে উঠল। আরও হতাশা ঘনিয়ে উঠল এখানে থাকার সময় যে সব গাছপালা, পুকুর, পুকুর পাড়ের উঁচু মাটির ঢিপির মধ্যে উঁইয়ের বাসা, যেগুলো এক সময় তার খুব প্রিয় ছিল, তার আশপাশে ঘুরতে ঘুরতে সব স্মৃতি মনে জাগছে– কেবল নামটি সে এখনও খুঁজে পেল না। বাড়ি ছেড়ে সে তার পুরনো স্কুলের ধারে গেল। না, মনে পড়ছে না। মনে মনে সব চিৎকার আর বিলাপ শেষ করার মুখে হঠাৎ তার এক স্কুলের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হতে তার সব কৌতূহলের অবসান হল।

এই বান্ধবীটিও তারই মত বিবাহিতা। কিন্তু তফাৎ একটাই। তা হল সে তার মত ঘর নিয়ে মেতে থাকাই জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করেনি। সে তার নামটিও মনে করতে পারল। সেই সঙ্গে পুরনো আরও সব বান্ধবীদের নামও একে একে মনের মধ্যে খুঁজে পেল। তাদের গৃহকর্ত্রীর নামটাও তার বান্ধবী অনায়াসে মনে করতে পারল।

'আরে সারদা! উঃ, কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা, বল্ তো?' বান্ধবীটি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। গৃহকর্ত্রী মেয়েটি এতক্ষণ এতদিন যাবৎ যেন একগলা তৃষ্ণা নিয়ে জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে মরতে বসেছিল। বান্ধবীর মুখে তার নামটি উচ্চারিত হতে শুনে ফোঁটা ফোঁটা জলে তার সমস্ত্ম গলা, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেল। বান্ধবী যেন তাকে নতুন জীবন দান করল। 'তুই তো সারদা। আমাদের স্কুলে ক্লাস টেনে তুই প্রথম এসে ভর্তি হলি। আর কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় তোকে প্রথম হতে দেখলাম। তুই ভারি সুন্দর ছবি আঁকতিস তখন। দশ বান্ধবী খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা। তুই ছাড়া আর সবার

সারদা নামের মেয়েটি, সেই গৃহকর্ত্রী যে সারাক্ষণ ঘরের পরিপাট্য নিয়ে মজে থাকত, ঘরের কোন্ কোণে একটু ধুলোবালি জমে আছে, কোন্ জিনিসটা কোথায় বেমানানভাবে রাখা আছে সব খুঁটিনাটি আগলে বেড়াত– এখন ঘরের সোফায় বসতে বসতে লক্ষ্য করল, সে দু'দিন হাত লাগায়নি বলে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে সোফার গায়ে। সে তা অগ্রাহ্য করে গা এলিয়ে বসেই থাকল।

সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। চিঠিও লিখি আমরা। খালি তুই একটু দলছুট হয়ে কোথায় হারিয়ে গেলি। কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলিরে এতদিন?

সে বলল, 'প্রমীলা, তুই যা বলছিস তা ঠিকই। আমি সারদা– কী বলব, তুই নাম ধরে ডাকার আগে আমি মনেই করতে পারছিলাম না আমার পুরনো আর আসল নামটা। এতদিন আমি কেবল আমার ঘরদোর সাজানোর ব্যাপারেই পুরো ডুবেছিলাম, তা বাদে বাইরের কোন কিছুতে আমার যেন কোন হুঁশ ছিল না। আজ তোর সঙ্গে দেখা না হলে আমি হয়তো শেষ অবধি পাগল হয়ে যেতাম।' গৃহকর্ত্রী সারদা গভীর আস্থার সঙ্গে কথাগুলো বলতে পেরে অনেকটা হাল্কা বোধ করল।

সারদা তারপর বাড়িতে তার চিলেকোঠায় এসে তার সার্টিফিকেটগুলো খুঁজে পেল। সেই সঙ্গে তার ছবির এ্যালবাম, আরও যা যা সে ভুলে গিয়েছিল– সব পেয়ে গেল। অনেক খুঁজতে খুঁজতে স্কুল আর কলেজের অনেকগুলো প্রাইজ তার হাতে উঠে এল। উলসিত, ভরপুর আনন্দে সারদা স্বামীর ঘরে ফিরে এল।

সারদার স্বামী বলল, 'তুমি বাড়ি ছিলে না, দেখ বাড়িটার হাল কী হয়েছে। যেন ছাড়াবাড়ি! তুমি এ লে আর মনে হচ্ছে চারদিকে উৎসবের ঝলক খেলে যাচ্ছে।' সারদা বলল, 'খালি মেঝে ঘর ধোয়া মোছা কোন উৎসবের মধ্যে পড়ে না। তা ছাড়া এখন থেকে তুমি আমায় আর ওগোহঁ ্যাগো বলে ডাকবে না। আমার একটা নাম আছে, সারদা। ওই নামে আমায় ডাকবে, বুঝলে?' বলতে বলতে সে খুশিতে গুনগুনিয়ে ঘরের ভিতরে গেল।

সারদা নামের মেয়েটি, সেই গৃহকর্ত্রী যে সারাক্ষণ ঘরের পরিপাট্য নিয়ে মজে থাকত, ঘরের কোন্ কোণে একটু ধুলোবালি জমে আছে, কোন্ জিনিসটা কোথায় বেমানানভাবে রাখা আছে সব খুঁটিনাটি আগলে বেড়াত– এখন ঘরের সোফায় বসতে বসতে লক্ষ্য করল, সে দু'দিন হাত লাগায়নি বলে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে সোফার গায়ে। সে তা অগ্রাহ্য করে গা এলিয়ে বসেই থাকল। বসে বসে তাকের ওপরে সাজানো তার সন্তানদের খেলনা পুতুলগুলোর দিকে চেয়েই থাকল– চোখের পলক না ফেলে।

অনুবাদ সুনীল আচার্য

লেখক পরিচিতি:

পি. সত্যবতী বর্তমান তেলেগু সাহিত্যে একটি উলেস্নখযোগ্য নাম। জন্ম অন্ধ্র প্রদেশে। তাঁর বিখ্যাত বই Mahmood Pravaktha Jeevithan, Ismath Chugathay Kadhulu, Melakura, Ragam Bhupalam ইত্যাদি। সাহিত্যের জন্য তিনি ২০১২ সালে Susheela Narayana Reddy Cultural Award পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ এবং একটি কলেজে পড়ান। বর্তমান গল্পটি তাঁর Telegu Short Story গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

উৎসব

দীপাবলি

ড. শ্রীপতি সিকদার

আলোর উৎসব দীপাবলি। আগুন আবিষ্কার সভ্যতার ক্রমবিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের আবিষ্কার। কাজেই আগুনের প্রতি তথা আলোর প্রতি প্রাচীন মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা স্বাভাবিক। ভারতীয় উপমহাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠীর দেশ। তাই এ ভূখণ্ডে আলোর প্রতি মানুষের ভালবাসা সুপ্রাচীন। আলো জ্ঞানেরও প্রতীক আর অজ্ঞানতা হচ্ছে ঘোর অন্ধকার। তাই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানালোকে উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশই হল দীপাবলি উদ্‌যাপন।

আলোর উৎসব বা দীপাবলি সনাতন হিন্দু ধর্মের এক প্রাচীন অনুষঙ্গ। বাংলাদেশ, ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায় তাই দীপাবলি উৎসবে মেতে উঠেন। এটি একটি বাৎসরিক উৎসব। বছর বছর এ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাই ঘোরতর অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের জ্যোতি আবাহন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জ্ঞান সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। দুর্গাপূজা বা দশেরা উৎসবের অব্যবহিত পরের অমাবস্যা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয় দীপাবলি।

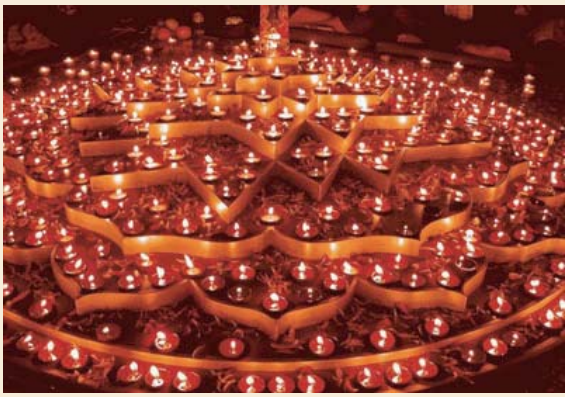

এ শুভদিনের পটভূমিতে বলা হয় যে, এ রাতে সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং মানুষের বাড়িঘর পরিদর্শন করেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ দিন তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন ও আলোকসজ্জা করে লক্ষ্মীদেবীকে স্বাগত জানান ও ভক্তিসহকারে তাঁর পূজা করেন। এ দিনে রাম-রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ এইদিন নরকাসুর রাক্ষসকে বধ করেন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে দীপাবলি পালন করে থাকেন, কারণ জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এদিন নির্বাণ লাভ করেন। সুতরাং দীপাবলি শুধুমাত্র পুণ্য অর্জনের জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি পালনের পটভূমিতে রয়েছে জ্ঞানালোকের মাধ্যমে যাবতীয় অন্ধকার সংস্কার দূর করার নিরন্তর প্রয়াস।

ড. শ্রীপতি শিকদার শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইসিসিআরএর আম ন্ত্রণে ভুবনেশ্বরে পার্থসামিনা-ফাহমিদাবা প্লার সঙ্গীতানুষ্ঠান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইসিসিআরএর আম ন্ত্রণে পাটনায় পার্থসামিনা-ফাহমিদাবা প্লার সঙ্গীতানুষ্ঠান

৩ অক্টোবর ২০১৩ আইসিসিআরএর আম ন্ত্রণে বেনারসে পার্থসামিনাফাহমিদা-বাপ্পার সঙ্গীতানুষ্ঠান

১৫ অক্টোবর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে অভয়া দত্তর সঙ্গীত পরিবেশন

১ নভেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে মান্না দের স্মরণসভায় অনুপ বড়ুয়ার সঙ্গীত পরিবেশন

৮ নভেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে ইফফাত আরা দেওয়ানের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

৯ নভেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে হিমাদ্রীশেখরের তালুকদারের সঙ্গীত পরিবেশন

১৬ নভেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে মোস্তফা জামান আব্বাসীর সঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra November 2013

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত